৯

বাংলায় মুসলিম শাসন

ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম ইউনিটে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা থেকে দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসের প্রধান প্রধান বিষয় স্থান পেয়েছে।

সর্বভারতীয় মুসলিম শাসনের প্রেক্ষাপটে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও বাংলার ভূখন্ডে মুসলিম শাসনের তিন শতাধিক বৎসরের ইতিহাস নবম ইউনিটের বিষয়।

বখতিয়ার খলজী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (১২০৪ খ্রিস্টাব্দে) বাংলার অংশ বিশেষে এবং সমগ্র বাংলায় বিস্তার লাভ করে চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে। এই প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের ইতিহাস প্রথম দু'টি পাঠের বিষয়বস্তু।

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মুসলিম শাসকগণ দিল্লির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করে। যে স্বাধীনতা চলেছিল দু'শ বছর ধরে। বাংলার এই দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সুলতান ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল; অবশ্য মাঝখানে স্থানীয় রাজা গণেশের উত্থান ঘটেছিল। ইলিয়াস শাহী শাসনের পর ক্ষণস্থায়ী হাবশী শাসন এবং হাবশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে উত্থান ঘটে হুসেন শাহী বংশের। আলাউদ্দিন হুসেন শাহই ছিলেন এই বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ও নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সুলতান।

ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী শাসনামল বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে বাংলার একক রাজনৈতিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়। বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ এই সময়কে করেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইলিয়াস শাহী শাসন স্থান পেয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে এবং পঞ্চম পাঠে রয়েছে হুসেন শাহী শাসন।

হুসেন শাহী যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব এই যুগকে করেছে মহিমান্বিত। এই কৃতিত্বের পর্যালোচনা রয়েছে ষষ্ঠ পাঠে। সপ্তম পাঠে আলোচনা করা হয়েছে বাংলার সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. বখতিয়ার খলজী ও বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম সাম্রাজ্য
- পাঠ-২. শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ও মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ
- পাঠ-৩. স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা ঃ ইলিয়াস শাহ
- পাঠ-৪. ইলিয়াস শাহী শাসন ঃ আযম শাহ, রাজা গণেশ ও পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতান
- পাঠ-৫. বাংলায় হুসেন শাহী শাসন ঃ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
- পাঠ-৬. হুসেন শাহী যুগের গৌরব
- পাঠ-৭. সুলতানি আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থা।

পাঠ - ১

বখতিয়ার খলজী ও বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম সাম্রাজ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- বখতিয়ার খলজীর সহজ সাফল্যের কারণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- খলজী মালিকদের অধীনে বাংলার চিত্র সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- ইওয়াজ খলজীর সাম্রাজ্য দৃঢ়ীকরণ বিষয়ে তথ্য পাবেন ;
- গিয়াসউদ্দিন বলবনের বাংলা অভিযান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বখতিয়ার খলজী

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশের সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু বৌদ্ধ শাসনের অবসান ঘটেও সূচনা হয় বিদেশী মুসলিম শাসনের। ইসলামের আগমন এদেশের ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতিতে আনে ব্যাপক পরিবর্তন।

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী। বখতিয়ার খলজী আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তুর্কিদের খলজী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে, মনে হয় দারিদ্র্যের পীড়নে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং স্বীয় কর্মশক্তির উপর নির্ভর করে ভাগ্যান্বেষণে সচেষ্ট হন। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী তখন ভারত উপমহাদেশে অভিযানে লিপ্ত। বখতিয়ার খলজী গজনীতে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর অধীনে সৈন্য বিভাগে চাকুরি প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। তখনকার দিনে প্রত্যেক সৈন্যকে নিজ নিজ ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্র (ন্যূনপক্ষে ঢাল-তলোয়ার) সংগ্রহ করতে হতো। কিন্তু সামর্থের অভাবে বখতিয়ার খলজী ঘোড়া বা অস্ত্র যোগাড় করতে পারেননি। তাছাড়া বেঁটে, লম্বা হাত এবং কুৎসিত চেহারার বখতিয়ার হয়তো সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। গজনীতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার খলজী দিল্লিতে আসেন এবং দিল্লির শাসনকর্তা কুতুবউদ্দিন আইবেকের দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানেও তিনি সেনাধ্যক্ষের সহানুভূতি পেতে ব্যর্থ হন। অত:পর তিনি বাদাউনে যান এবং বাদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দিন তাঁকে নগদ বেতনে চাকুরিতে নিয়োগ করেন। কিন্তু বখতিয়ার এই ধরনের চাকুরিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিছুদিন চাকুরি করার পর তিনি অযোধ্যায় যান। অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামউদ্দিন বখতিয়ার খলজীর প্রতিভা অনুধাবন করেন এবং তাঁকে ভিউলী ও ভাগওয়াত নামে দুইটি পরগণার জায়গীর প্রদান করেন এবং মুসলমান রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে সীমান্তরক্ষীর কাজে নিযুক্ত করেন।ভিউলী ও ভাগওয়াত আধুনিক উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে এসে বখতিয়ার খলজী তাঁর ভবিষ্যত উন্নতির সন্ধান পান।

বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা জয় এবং বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বখতিয়ার খলজীর জায়গীর সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বীয় রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এসব পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো আক্রমণ ও লুণ্ঠন

করতে থাকেন।এ সময়ে তাঁর বীরত্বের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, চারিদিক থেকে অনেক ভাগ্যান্বেষণকারী মুসলমান বিশেষ করে খলজী সম্প্রদায়ের লোক তাঁর সাথে মিলিত হয় এবং এভাবে বখতিয়ার খলজীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে অগ্রসরমান বখতিয়ার খলজী তরবারি পরিচালনার মাধ্যমে ওদন্তপুরী বিহার জয় করেন।বিহার বিজয়ের পর বখতিয়ার অনেক ধনরত্নসহ কুতুবউদ্দিন আইবকের সঙ্গে দিল্লিতে সাক্ষাত করতে যান। এখানে আরো সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং এরপরই নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময় বাংলার রাজা লক্ষণসেন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খলজী এতই ক্ষিপ্রতার সাথে ঝাড়খন্ড অরণ্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে এসে নদীয়া আক্রমণ করেন যে, তাঁর সঙ্গে মাত্র আঠারজন অশ্বারোহী ছিল এবং তাঁর মূল বাহিনী পেছনে ছিল। তিনি সোজা রাজা লক্ষণসেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং প্রাসাদরক্ষীদের হত্যা করেন। ইতোমধ্যে শহরের অভ্যন্তরে শোরগোল শোনা যায়। রাজা লক্ষণসেন তখন মধ্যাহ্নভোজে লিপ্ত ছিলেন। খবর শুনে তিনি পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন এবং পূর্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই নদীয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। পরে সম্পূর্ণ বাহিনী বখতিয়ার খলজীর সাথে মিলিত হয়। তিনি তিন দিনব্যাপী নদীয়া লুণ্ঠন করেন এবং রাজা লক্ষণসেনের বিপুল ধনসম্পদ এবং অনেক হস্তি বখতিয়ার খলজীর হস্তগত হয়। অত:পর বখতিয়ার খলজী নদীয়া ত্যাগ করেন এবং লখনৌতি বা লক্ষণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। লখনৌতি বা লক্ষণাবতী বা গৌড়েই মুসলমান আমলে বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। অত:পর বখতিয়ার খলজী তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ্ তৈরি করেন।

বখতিয়ারের সহজ সাফল্যের কারণ

বখতিয়ার খলজীর জায়গীর সীমান্ড় এলাকায় অবস্থিত থাকায় তিনি রাজ্যবিস্ড়ারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই অভিলাষে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যগুলোতে অভিযান পরিচালনা করেন। পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যগুলোতে পূর্বেই তুর্কি বিজয়ের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তদুপরি তাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধি থাকাতে তাদের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। বখতিয়ার খলজীর ন্যায় একজন বীরের জন্য এটি ছিল উপযুক্ত সুযোগ এবং তিনি কিছু সংখ্যক সৈন্য সহকারে এক একটি করে হিন্দু রাজ্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করতে থাকেন। এভাবে অগ্রসর হওয়ার সময় একদিন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে একটি প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের সম্মুখীন হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তরবারি পরিচালনা করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হতে তিনি কোন বাধাই পেলেন না। বিনা প্রতিরোধে ওদন্তপুরী বিহার জয় করে নেন। এভাবে প্রতিরোধহীনতা এবং কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক পুরস্কার লাভ উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার খলজীর রাজ্য বিস্তারের স্পৃহা ক্রমশ: বাড়িয়ে দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে তিনি নদীয়া আক্রমণ করেন এবং বিনা যুদ্ধেই নদীয়া জয় করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া বখতিয়ার খলজীর কৌশলগত নীতি বাংলা জয়কে অনেক সহজ করে দেয়। পশ্চিম দিক হতে বাংলায় প্রবেশের স্বাভাবিক পথ ছিল রাজমহলের নিকটবর্তী তেলিয়াগড়ি গিরিপথ। তেলিয়াগড়ির দক্ষিণে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল 'ঝাড়খন্ড' নামে অভিহিত। তেলিয়াগড়ির উত্তর-পশ্চিমে ছিল খরস্রোতা নদী। সুতরাং তেলিয়াগড়ি জয় করতে না পারলে পশ্চিম দিক হতে কোন আক্রমণকারীর পক্ষে বাংলায় প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। খুব সম্ভব রাজা লক্ষণসেন তেলিয়াগড়ি গিরিপথ রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজী শুধু দুর্ধর্ষ বীরই ছিলেন না, তিনি একজন কৌশলী সমরবিদও ছিলেন। তিনি তেলিয়াগড়ির ধার দিয়েও গেলেন না, বরং গোপনে প্রস্তুতি নিয়ে 'ঝাড়খন্ড' বা দুর্গম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলেন। যেহেতু দুর্গম অঞ্চলের ভিতর দিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ একসঙ্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করেন এবং তিনি নিজে এরূপ একটি ক্ষুদ্র দলের প্রথমটির নেতৃত্ব দেন। ফলে তিনি যখন নদীয়া পৌঁছেন, তখন কেউ ভাবতেও পারেননি যে, তুর্কি বীর বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করতে এসেছেন। এবং সকলেই মনে করে যে, তাঁরা ঘোড়া ব্যবসায়ী এবং রাজা লক্ষণসেনের দরবারে ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছেন। কিন্তু যখন রাজা লক্ষণসেন বুঝতে পারেন যে, বখতিয়ার খলজী আক্রমণকারী মুসলিম

সৈন্যবাহিনীর নায়ক তখন লক্ষণসেন রাজধানী বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। প্রায় বিনা প্রতিরোধে খুব সহজেই বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তিব্বত অভিযান

বখতিয়ার খলজীর জীবনের শেষ কাজ তিব্বত অভিযান। হয়তোবা বখতিয়ার খলজী তুর্কিস্থানের সঙ্গে সোজা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিব্বত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা দুর্দম্য সাহসী তুর্কি বীরের তিব্বত অভিযান বিফল হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিব্বত পর্যন্ত তিনি যেতে পারেননি বলে মনে হয়। তবে তিনি খুব সতর্কতার সাথে তিব্বত অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং লখনৌতি হতে তিব্বত পর্যন্ত রাস্তার সংবাদ সংগ্রহ করেন। সকল প্রস্তুতির পর বখতিয়ার খলজী দশ হাজার সৈন্যসহ লখনৌতি হতে তিব্বতের দিকে রওয়ানা হন। উত্তর-পূর্ব দিকে কয়েকদিন চলার পর বর্ধনকোট শহরের পূর্বদিকে 'বেগমতী' নামক নদী অতিক্রম না করে বখতিয়ার খলজী উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এভাবে ১৫ দিন চলার পর একটি শস্যশ্যামলা স্থানে একটি দুর্গ দেখতে পান। বখতিয়ার খলজী তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সেখানে পৌঁছালে দুর্গের সৈন্যরা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণ মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে বখতিয়ার খলজী জয়লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পক্ষের অনেক সৈন্য যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। রাতে বন্দি শত্রুসৈন্যরা তাঁকে জানায় যে মাত্র কয়েক মাইল দূরে করমবত্তন নামে একটি শহর আছে, সেখানে কয়েক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। বখতিয়ার খলজী তখন লখনৌতি প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু ১৫ দিনের রাস্তায় তাঁর সৈন্যবাহিনী বা ঘোড়া কোনরূপ খাবার সংগ্রহ করতে পারেনি, কারণ পার্বত্য এলাকার লোকেরা পথের সকল শস্য বা ঘোড়ার খাদ্য পূর্বেই নষ্ট করে ফেলে। ফলে, অনেকে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইতোমধ্যে লখনৌতি ফেরার পথে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের পার্বত্য লোকেরা চারিদিক হতে তাঁদেরকে আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় তাঁরা নিকটস্থ একটি মন্দিরে আশ্রয় নিলে সেখানেও তাঁরা শত্রুদের হাত হতে নিস্তার পেলেন না এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দেবকোটে ফিরে আসেন। বখতিয়ার খলজী দেবকোটে অবস্থানকালে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিপুল সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় শোকে এবং ব্যর্থতার গ্লানিতে বখতিয়ার খলজী ভেঙ্গে পড়েন।এভাবে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। বখতিয়ার খলজীর ব্যর্থ তিব্বত অভিযানে বিশাল বাহিনী ধ্বংস হওয়ায় বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলো এ সুযোগে শক্তি বৃদ্ধির সময় পায়। অপরপক্ষে লখনৌতির মুসলমান সেনানায়কদের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে দিল্লির সাথে বিরোধে লখনৌতির মুসলমানেরা সংঘবদ্ধভাবে বাধা দিতে পারেনি। ফলে দিল্লির মুসলিম সুলতান বাংলায় ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ পায়।

খলজী মালিকদের অধীনে বাংলা

মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই লখনৌতির মুসলমান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বখতিয়ার খলজীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর অন্যতম প্রধান অমাত্য মুহাম্মদ শীরাণ খলজী লখনৌতির হতে তাড়াতাড়ি দেবকোটে ফিরে আসেন। অত:পর দেবকোটে উপস্থিত খলজী আমীর এবং সৈনিকবৃন্দ তাঁকে নেতা নির্বাচিত করেন এবং তিনি লখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবত এক বৎসরকাল (১২০৭-১২০৮ খ্রি:) শাসন করেন। দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবককে বখতিয়ার খলজীর অপর প্রধান অমাত্য আলী মর্দান খলজী প্ররোচিত করেন লখনৌতি আক্রমণ করার জন্য। কুতুবউদ্দিনও হয়তো সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমাজ রুমীকে লখনৌতি অভিযানে পাঠান এবং লখনৌতির খলজী মালিকদের বিরোধ মীমাংসা করতে আদেশ দেন। কায়েমাজ রুমী ১২০৭ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন এবং বিনা যুদ্ধেই দেবকোট অধিকার করেন এবং হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজীকে দেবকোটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে অযোধ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যুদ্ধে শীরাণ

খলজী পরাজিত হয়ে মাযেদা ও সন্তোষের (বগুড়া ও দিনাজপুর) দিকে পলায়ন করেন। এভাবেই মুহাম্মদ শীরাণ খলজীর শাসনকাল শেষ হয়।

হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজী দিল্লির অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসেবে লখনৌতির মুসলিম রাজ্য শাসন করতে থাকেন অর্থাৎ লখনৌতি দিল্লির অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইওয়াজ খলজী এই পদে প্রায় ২ বছর (১২০৮-১০ খ্রি:) পর্যন্ত বহাল ছিলেন। কিন্তু এরপর আলী মর্দান খলজী আবার লখনৌতিতে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে আলী মর্দান খলজী দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক আলী মর্দানকে লাহোরে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বন্ধুত্বের পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলী মর্দান খলজী বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ লখনৌতির দিকে যাত্রা করেন। আলী মর্দান খলজী কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় আইবকের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত হবে না বুঝতে পেরে ইওয়াজ খলজী কুশী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আলী মর্দান খলজীকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি স্বেচ্ছায় আলী মর্দানের হাতে শাসনভার ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। আলী মর্দানের শাসনভার গ্রহণ করার অল্পদিন পর লাহোরে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের মৃত্যু হয়। এই সুযোগে আলী মর্দান খলজী সুলতান আলাউদ্দিন উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই হিসেবে সুলতান আলাউদ্দিন আলী মর্দান বাংলার প্রথম মুসলমান স্বাধীন সুলতান। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার পর তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে থাকেন। লখনৌতির খলজী আমীরদের প্রতিও তিনি অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। খলজী আমীরেরা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং গোপনে সুলতান আলাউদ্দিন আলী মর্দানকে সম্ভবত ১২১২ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করেন। অত:পর হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজী সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী নি:সন্দেহে খলজী মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আফগানিস্তানের গরমশিরের অধিবাসী ছিলেন। কালক্রমে তিনি মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর সৈন্যদলে যোগ দেন এবং নিজ বুদ্ধি, সাহস ও চরিত্রের বলে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের শাসকে পরিণত হন। লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে তিনি শক্তিশালী এবং সংঘবদ্ধ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেবকোট থেকে রাজধানী আবার লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন এবং রাজধানীর প্রতি রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোর্ট নামে একটি দুর্গ তৈরি করেন। লখনৌতি নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত ছিল। তাছাড়া ইওয়াজ খলজী বুঝতে পারেন যে, নদীমাতৃক পূর্ব বাংলাকে জয় করতে হলে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাকে শাসনাধীনে রাখতে হলে নৌবহরের প্রয়োজন; ফলে রাজধানী নদীর সন্নিকটে হলে নৌবাহিনী গড়ে তুলতে সুবিধা হবে। এতদিন তুর্কিরা অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এই কারণে তারা নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা দখল করতে সমর্থ হয়নি। এসব দিক বিবেচনা করে বাংলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে ইওয়াজ খলজিই প্রথম নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন এবং বাঙালি নাবিকদের সাহায্যে যুদ্ধ জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। এই নৌবাহিনীর দ্বারা তিনি একদিকে যেমন রাজধানী লখনৌতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, অন্যদিকে পূর্ব বাংলা জয়েরও পরিকল্পনা করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী নিঃসন্দেহে একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন আলী মর্দানের সময় খলজী আমীর ও অন্যান্য প্রজাসাধারণ যে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছিল তিনি তা দূর করেন এবং লখনৌতির সকল অধিবাসীকে একতাবদ্ধ করেন। এভাবে লখনৌতিতে শান্তি স্থাপন করার পর তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি উড়িষ্যা, কামরূপ, ত্রিহুত এবং পূর্ব-বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং এসব রাজ্যের রাজারা তাঁর নিকট কর পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর লখনৌতির খলজী আমীরদের মধ্যে অর্ন্তবিরোধের সুযোগ নিয়ে উড়িষ্যার সেনাপতি বিষ্ণু লখনৌতির অধিকার করেন। ইওয়াজ খলজী লখনৌতির পুরর্দখল করে, উড়িষ্যার রাজাদের কর প্রদানের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ইওয়াজ খলজী করতোয়া

নদীর পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্যে অভিযান চালান এবং সেখানকার সামন্ত শাসকদের অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটিয়ে তাদের কাউকে কাউকে করদানে বাধ্য করেন। লখনৌতির পূর্বদিকে অবস্থিত, ত্রিহুতের অর্ন্তবিরোধের সুযোগ নিয়ে ইওয়াজ খলজী ত্রিহুত আক্রমণ করেন এবং মুসলিম শাসনের অধীনে আনেন। ১২২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে ইওয়াজ খলজী পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেন। লক্ষণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন ঐ সময়ে বিক্রমপুরে রাজত্ব করতেন এবং ইওয়াজ খলজী পূর্ববাংলা আক্রমণ করে কিছু কিছু এলাকায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

বখতিয়ার খলজীর পরে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীই সর্বপ্রথম রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন এবং তিনি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম সবদিকেই স্বীয় রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। দিল্লির সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ তাঁকে বাধা না দিলে হয়তো স্বপ্ন সফল হতো।

দিল্লির সুলতানেরা বাংলাকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখতো। ইওয়াজ বাংলায় নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করে স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন। ইওয়াজ খলজীর স্বাধীনতাকে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ সুনজরে দেখেননি। আনুমানিক ১২২৫ খ্রিস্টাব্দ সুলতান ইলতুৎমিশ ইওয়াজ খলজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে পরাজিত ইওয়াজ খলজী ইলতুৎমিশের অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু ইলতুৎমিশের দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পর বিহারে তাঁর নিযুক্ত মালিক আলাউদ্দিন জানীকে ইওয়াজ খলজী বিহার হতে তাড়িয়ে দেন, ফলে ইলতুৎমিশ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ লখনৌতিতে প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধে ইওয়াজ খলজী পরাজিত হন। অত:পর তিনি বন্দি হন এবং পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। এভাবে ইওয়াজ খলজীর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং বাংলার মুসলিম রাজ্য আবার দিল্লির অধীনে চলে যায়।

বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীই সর্বপ্রথম মুসলিম সুলতান যার মুদ্রা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইওয়াজ খলজী সামরিক কারণে এবং প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য রাজধানী লখনৌতির সাথে উত্তরে দেবকোট এবং দক্ষিণে লখনৌতির অর্থাৎ দুই সীমান্ত শহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে একটি দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। ফলে, যুদ্ধের সময় সৈন্য চলাচলের যেমন সুবিধা হয়, তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। স্থানে স্থানে বাধ দিয়ে তিনি কৃষকদেরকেও বন্যার কবল হতে রক্ষা করেন। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ তৈরি করেন। সুতরাং বলা যায় যে, ইওয়াজ খলজী বাংলার খলজী শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সুশাসক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমান রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রবর্তন করেছিলেন বটে, কিন্তু ইওয়াজ খলজীই মুসলিম শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। বাংলায় মুসলিম রাজ্যের স্থায়ীত্বে তাঁর অবদান অবশ্য স্বীকার করতে হবে। নৌবহর গড়ে তুলে তিনিই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় মুসলিম সম্প্রসারণের পথ সুগম করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের বাংলা অভিযান

১২২৭ খ্রিস্টাব্দ সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীর পরাজয় ও মৃত্যুর পর বাংলার মুসলিম রাজ্য দিল্লির মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর দিল্লির দুর্বল শাসনের সুযোগে বাংলায় মুসলমান শাসনকর্তারা একাধিকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লির সিংহাসন আরোহণ করে লখনৌতির বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। বলবন জানতেন যে, বাংলা সর্বদা বিদ্রোহ করে।সুতরাং তিনি আমীন খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা এবং তুঘ্রিল খান সহকারি গভর্নর নিযুক্ত করেন– যাতে একে অপরের বিদ্রোহাত্মক কাজে বাধা দিতে পারে এবং দৈনন্দিন ঘটনা সুলতানের গোচরে আনতে পারে। কিন্তু তুঘ্রিল খান অল্পদিনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে তাঁর উপরিস্থ গভর্নর আমীন খানকে বহিষ্কার করেন এবং লখনৌতির রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং বিপুল ধনরত্ন ও হাতি হস্তগত করার পর তুঘ্রিল খানের মনে স্বাধীন হবার সাধ জাগে। তিনি প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে যুদ্ধলব্ধ অর্থ দিল্লিতে না পাঠিয়ে নিজে রেখে

দেন। তিনি পূর্ববঙ্গে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সোনারগাঁও-এর নিকটবর্তী এলাকা পর্যন্ত জয় করেন। সোনারগাঁও-এর অদূরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেন যা 'তুঘ্রিলের কিল্লা' বা 'নারকিল্লা' নামে অভিহিত।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গলেরা পাঞ্জাব সীমান্তে প্রায় প্রতি বৎসরই আক্রমণ চালায়; তাই, বলবন তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে পাঞ্জাব সীমান্তে গমন করেন এবং সেখানে প্রায় দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে কিছুদিন দরবারে উপস্থিত হতে অপারগ হয়ে পড়েন। ফলে, বাইরে রটে যায় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যু হয়েছে। এই সুযোগে বাংলায় তুঘ্রিল খানের অনুচরেরা তাঁকে স্বাধীনতা ঘোষণার পরামর্শ দেন এবং তুঘ্রিল তাঁর অনুচরদের পরামর্শ মেনে সুলতান মুগিসউদ্দিন নাম ধারণ করে লখনৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

তুঘ্রিল কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার খবর পেয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। তিনি তুঘ্রিলকে শাস্তি দেয়ার জন্য অযোধ্যার গভর্নর মালিক তুরমতীকে সেনাপতি নিযুক্ত করে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। ত্রিহুতের নিকট উভয় বাহিনী সামনাসামনি শিবির স্থাপন করে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে রইল। দূরদর্শী তুঘ্রিল খান এই সুযোগে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নতুন নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং দিল্লির সৈন্যবাহিনীর সেনানায়কদের মধ্যে গোপনে প্রচুর ধনরত্ন বিলি করেন। এতে দিল্লিস্থ বাহিনীর অনেকেই ভিতরে ভিতরে তুঘ্রিল খানের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধ আরম্ভ হলে দিল্লির সৈন্যবাহিনীর অনেকেই যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে। ফলে, দিল্লি বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং পলায়ন করে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এর পরের বৎসর তুঘ্রিলকে দমন করার জন্য শিহাবউদ্দিন নামে আর একজন সেনাপতির অধীনে এক নতুন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু হঠাৎ দিল্লির সৈন্যবাহিনীর কিছু অংশ যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়ায়। সম্ভবত, তুঘ্রিলের নিকট হতে তারা গোপনে উৎকোচ গ্রহণ করেছিল। ফলে, শিহাবউদ্দিনও পরাজিত হয়ে দিল্লি ফিরে যান। অত:পর ১২৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দিকে সুলতান বলবন নিজে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ লখনৌতি আক্রমণ করেন। পথে দোয়াব ও অযোধ্যা হতে তিনি অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেন। বলবন লখনৌতির কিছু দূরে পৌঁছলে তুঘ্রিল লখনৌতি ছেড়ে পলায়ন করেন। বলবন সিপাহসালার হিসামউদ্দিনকে লখনৌতির শাসক নিযুক্ত করেন। অত:পর বলবন তুঘ্রিলের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তুঘ্রিল সোনারগাঁও-এর সন্নিকটে নির্মিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু বলবন সোনারগাঁও-এর রাজা দনুজ রায়ের সাহায্যে দুর্গ আক্রমণের প্রাক্কালে তুঘ্রিল উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন। বলবন খবর পেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তুঘ্রিলকে অনুসরণ করেন। এবং উভয় সৈন্যদলকে কয়েকভাগে ভাগ করে তুঘ্রিলের খোঁজে পাঠান। একদিন এইরূপ এক ক্ষুদ্রবাহিনী মালিক শের মান্দাজের অধীনে বেশ কয়েক মাইল দূরে যায় এবং একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মালিক জানতে পারেন যে, মাইল খানেক দূরে একটি নদীর তীরে তুঘ্রিল শিবির স্থাপন করেছেন। মালিক শের মান্দাজ তাঁর ক্ষুদ্রবাহিনীসহ ক্ষিপ্রগতিতে তুঘ্রিলের শিবির আক্রমণ করেন এবং তুঘ্রিল এইরূপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সৈন্যরা যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায় এবং তুঘ্রিল নিজে সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ একটি তীর বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন কিছুদিন লখনৌতিতে অবস্থান করেন এবং পুত্র বুঘরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লি ফিরে যান, ফলে বাংলা আবার দিল্লির শাসনাধীনে আসে।

সার সংক্ষেপ

হিন্দু-বৌদ্ধ শাসনের অবসানের পর মুসলিম শাসকদের আগমন বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন বয়ে আনে। বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কালে বখতিয়ার খলজী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিজের দৃঢ়তা, অভিযানে ঝাড়খন্ড অঞ্চল ব্যবহার এবং ঝটিকা আক্রমণ বখতিয়ারের সহজ সাফল্যের কারণ। খলজী মালিকদের অধীনে (আলী মর্দান খলজী, শীরান খলজী) বাংলায় মুসলমান শাসন অব্যাহত থাকে। এরপর ইওয়াজ খলজী লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করতে শুরু করেন। মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলায় নৌবাহিনীর পত্তন করেন। তাঁর আমলের অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। ইওয়াজ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়

মুসলিম সম্প্রসারণের পথ সুগম করেন। ইওয়াজের মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতান বলবন বাংলা অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় বুঘরা খান লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং বাংলা দিল্লির শাসনাধীনে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। বখতিয়ার খলজী কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?
(ক) আফগানিস্তানের গরমশির (খ) মধ্য এশিয়ার
(গ) উত্তর ভারতের (ঘ) দক্ষিণ ভারতের।

২। বখতিয়ার খলজী কোন বিহার জয় করেন?
(ক) সোমপুর বিহার (খ) শালবন বিহার
(গ) ওদন্তপুরী বিহার (ঘ) আনন্দ বিহার।

৩। বখতিয়ারের নদীয়া আক্রমণের পথ কোনটি?
(ক) তেলিয়াগড় (খ) ঝাড়খন্ড
(গ) দেবকোট (ঘ) সোনারগাঁও।

৪। খলজী মালিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?
(ক) বখতিয়ার খলজী (খ) আলী মর্দান খলজী
(গ) শীরাণ খলজী (ঘ) ইওয়াজ খলজী।

৫। সোনারগাঁও-এর দুর্ভেদ্য দুর্গের নাম–
(ক) তুঘ্রিলের কিল্লা (খ) বাঁশের কিল্লা
(গ) বসনকোর্ট দুর্গ (ঘ) একডালা দুর্গ।

৬। দনুজ রায় কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?
(ক) সাতগাঁও (খ) লখনৌতি
(গ) সোনারগাঁও (ঘ) চট্টগ্রাম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানের বিবরণ দিন।

২। আলীমর্দান খলজী সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা বিজয় অভিযান পর্যালোচনা করুন।

২। বখতিয়ার খলজীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

৩। গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীর আমলে মুসলিম বাংলার সীমানা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল? তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

৪। গিয়াসউদ্দিন বলবনের বাংলা অভিযানের ফলাফল বর্ণনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানি আমল।*

২। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব।*
৩। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৪। J.N. Sarkar, *History of Bengal* Vol-2.

পাঠ - ২

সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ ও মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের বংশ পরিচয় ও ক্ষমতারোহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- সাতগাঁও, ময়মনসিংহ, সিলেটে ফিরোজ শাহের অভিযান সম্পর্কেজানবেন।

বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রায় শতাব্দী কাল বাংলার ইতিহাস দিল্লি ও বাংলার মধ্যে বোঝাপড়ার ইতিহাস। দিল্লি বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করলেও প্রায়ই বাংলার শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীর স্বাধীনতা বা তুঘ্রিলের বিদ্রোহ এই ধারারই প্রকাশ। দিল্লির সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশকে ইওয়াজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তেমনি তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমনে বাংলা অভিযানে আসতে হয়েছিল গিয়াসউদ্দিন বলবনকে। বলবন বিদ্রোহ দমন করে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর পুত্র বুঘরা খানকে। বাংলার এই বিদ্রোহ প্রবণতা লক্ষ করে সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী লখনৌতিকে 'বলঘাক্পুর' (বিদ্রোহের নগরী) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

বুঘরা খান বলবনের মৃত্যুর (১২৮৬ খ্রিঃ) পর নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলেন, ঘোষণা করেছিলেন। এই স্বাধীনতার সূত্র ধরেই সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের আবির্ভাব ঘটেছিল।

বাংলার ইতিহাসে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালের প্রথম দিকে লখনৌতি সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের অধীনে স্বাধীন ছিল। দিল্লির খলজী সুলতানদের আমলে লখনৌতি বরাবর স্বাধীনতা ভোগ করছিল। কিন্তু দিল্লিতে তুঘলক বংশ ক্ষমতা দখল করার পরে তাঁরা লখনৌতি পুনরাধিকার করেন। আবার দিল্লিতে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের মধ্যভাগে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা স্বাধীন হয়ে যায়। আর বাংলার এই স্বাধীনতা দুইশত বৎসরকাল স্থায়ী হয়।

বংশ পরিচয়

শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, সুলতান রুকনউদ্দিন কায়কাউসের পর সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। লখনৌতি ও সোনারগাঁও টাকশাল থেকে ৭০১ হতে ৭২২ হিজরি অর্থাৎ ১৩০১ হতে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উৎকীর্ণ তাঁর অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাছাড়া তাঁর রাজত্বকালের তিনটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রা ও শিলালিপিতে শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের নাম ও উপাধি পাওয়া যায় এবং তিনি নিজেকে সুলতানরূপে দাবি করেন। কিন্তু তাঁর পিতার নাম বা তাঁর পিতাও যে সুলতান ছিলেন এমন কোন উল্লেখ মুদ্রায় বা লিপিতে নেই। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন যে, শামসউদ্দিন ফিরোজ নাসিরউদ্দিন বুঘরা খানের পুত্র ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রুকনউদ্দিন কায়কাউসের ভাই ছিলেন। আধুনিক পন্ডিতদের মধ্যে এডওয়ার্ড টমাস সর্বপ্রথম এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ইবনে বতুতার সাক্ষ্য গ্রহণ করে শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পৌত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হেনরী ব্লখম্যানও ইবনে বতুতার

সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং টমাসের সঙ্গে একমত হয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় যে, ইবনে বতুতার বিবরণে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি রয়েছে। সুতরাং একমাত্র এই সূত্রের ওপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তই নির্ভুল বলে দাবি করা যায় না।

এছাড়াও অন্যান্য সূত্র বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আমীর খসরু বুঘরা খানের মাত্র দুই ছেলের নাম উল্লেখ করেছেন– কায়কোবাদ, যিনি বলবনের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কায়কাউস, যিনি বুঘরা খানের মৃত্যুর পর লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমীর খসরু ফিরোজ শাহের কথা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া ফিরোজ শাহের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে এমন কোন দাবি করা হয়নি যে, তিনি সুলতানের পুত্র ছিলেন। কায়কাউস নিজেকে মুদ্রায় সুলতানপুত্র হিসেবে দাবি করেছেন এবং শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের পুত্রগণও নিজেদেরকে মুদ্রায় সুলতানের পুত্র বলে দাবি করেছেন। শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ যদি সুলতান বুঘরা খানের পুত্র হতেন তবে তা উল্লেখিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। তৃতীয়ত, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন পারস্যের রীতিনীতি আদব-কায়দা পছন্দ করতেন বলে পারস্যের সম্রাটদের নামের অনুকরণে পৌত্রদের নামকরণ করেন। যেমন– কায়কোবাদ, কায়কাউস, কায়খসরু, কায়মুর্‌স ইত্যাদি। শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের নাম এই নিয়মের ব্যতিক্রম। চতুর্থত: দেখা যায় যে, ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে কায়কোবাদ (বুঘরা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১৮ বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ শাহ যদি কায়কোবাদের তৃতীয় ভ্রাতা হন তাহলে ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর বয়স ২৫/২৬ বৎসর হবে। কিন্তু শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের প্রথমদিকেই তাঁর দুই তিনজন পুত্র কর্তৃক শাসনকার্যে পিতাকে সাহায্য করতে দেখা যায়। অর্থাৎ এই বয়সে তাঁর একাধিক প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল। সুতরাং শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের কায়কোবাদের তৃতীয় ভ্রাতা হবার সম্ভাবনা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। উপর্যুক্ত কারণে মনে করা হয় যে, শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ বলবনের বংশসম্ভূত ছিলেন না। বলবনের বংশের সাথে তাঁর সম্পর্কের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ক্ষমতা দখল

আবশ্যকীয় উপকরণের অভাবে সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের বংশ পরিচয় হয়তো কোনদিন পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রাপ্ত সূত্রগুলো থেকে শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ কিভাবে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সম্বন্ধে পন্ডিতগণ অনুমান করেন যে, গিয়াসউদ্দিন বলবন বুঘরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁকে উপদেশ ও সাহায্যদানের জন্য দুজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বাংলায় রেখে যান। ইসামীর মতে, এই দুজনের নামই ছিল ফিরোজ। জিয়াউদ্দিন বারাণী একজনের নাম শামসউদ্দিন বলে উল্লেখ করেছিলেন। অনুমান করা হয় যে, কায়কাউসের রাজত্বকালে বিহারের শাসনকর্তা ফিরোজ ইতগীন খুব সম্ভবত এই দুইজনের মধ্যে একজন এবং তিনিই পরবর্তীকালে লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। কায়কাউস হয় অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন এবং ফিরোজ শাহ ক্ষমতা দখল করেন; কিংবা এমনও হতে পারে যে, কায়কাউসকে অপসারিত করে ফিরোজ শাহ ক্ষমতা দখল করেন। তবে, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো উপাদানের অভাবে উপর্যুক্ত উভয় সিদ্ধান্তই আনুমানিক।

মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার

বখতিয়ার খলজীর পর শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সময়ে বাংলায় মুসলিম রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। ইতোপূর্বে বাংলার মুসলিম রাজ্য বিহার, উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় লখনৌতির পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতান রুকনউদ্দিন কায়কাউসের রাজত্বকালে রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয়। হুগলী জেলার সাতগাঁও অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার তাঁর সময়েই আরম্ভ হয়। কায়কাউস বঙ্গ অঞ্চলেও কিছু

সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সময়েই বঙ্গ এবং সাতগাঁও জয় সম্পূর্ণ হয়। কায়কাউসের সময় বঙ্গের রাজস্ব থেকে মুদ্রা জারি করা হয়। কিন্তু ফিরোজ শাহের সময়ে বঙ্গ স্থায়ীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সোনারগাঁও-এ একটি টাকশাল স্থাপিত হয়। সোনারগাঁও টাকশাল হতে ৭০১ হিজরি (১৩০১ খ্রিঃ) হতে মুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছিল। সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও ছাড়াও ফিরোজ শাহের শাসনামলে ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।এককথায় বলা যায় যে, প্রত্যন্ত এলাকা ছাড়া প্রায় সমগ্র বাংলা সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সময়ে মুসলমানদের অধিকারে আসে।

সাতগাঁও জয়

সাতগাঁও বিজয়ের সুস্পষ্ট ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা কষ্টসাধ্য। সুলতান রুকনউদ্দিন কায়কাউসের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, জাফর খান নামক তাঁর একজন শাসনকর্তা সাতগাঁও জয় করেন এবং তিনি সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শামসউদ্দিন ফিরোজের রাজত্বকালে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ আর একটি শিলালিপি হতে জানা যায় যে, তিনি এ সময়ে (১৩১৩খ্রিস্টাব্দে) 'দার-উল-খয়রাত' নামক একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ত্রিবেণীস্থ জাফর খানের সমাধিভবনের রক্ষক খাদেমদের কাছে প্রাপ্ত কুরছিনামায় এক জাফর খান গাজির উল্লেখ আছে যিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন। কুরছিনামায় বলা হয়েছে যে, জাফর খান গাজি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য বাংলায় আগমন করেন। তিনি রাজা মান নৃপতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু হুগলীর রাজা ভুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। সুতরাং বোঝা যায় যে, মুসলমানদের সাতগাঁও জয়ের সঙ্গে জাফর খানের নাম জড়িত। সাতগাঁও বিজয়ের সাথে শাহ সফিউদ্দিন নামক অন্য এক সুফির নামও জড়িত আছে। জনশ্রুতি আছে যে, শাহ সফিউদ্দিন সুলতান ফিরোজের শ্যালক ছিলেন এবং তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন। তিনি হুগলীতে পান্ডব রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং জাফর খান গাজি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। উপর্যুক্ত জনশ্রুতিতে কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন– সুলতান ফিরোজ শাহ, পান্ডব রাজা, জাফর খান গাজি এবং শাহ সফিউদ্দিন। শিলালিপি সাক্ষ্যে প্রমাণ হয় যে, জাফর খান গাজি সাতগাঁও জয় করেন এবং যেহেতু শিলালিপিগুলো ১২৯৮ হতে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ সেহেতু নিশ্চিতভাবে শাহ সফিউদ্দিনের সময়কাল ঐ সময়ের মধ্যে নিরূপণ করা যায়। একই সূত্রে, সুলতান ফিরোজ শাহকেও সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়।

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহ হতে মুসলমানদের সাতগাঁও বিজয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ করা সম্ভব। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রুকনউদ্দিন কায়কাউসের সময়ে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ বা তার কয়েক বছর আগে মুসলমান বিজয় শুরু হয়। জাফর খান নামক একজন মুসলমান সেনাপতি সাতগাঁও আক্রমণ করেন। ইতোপূর্বে জাফর খান দিনাজপুর অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং কায়কাউস এই জাফর খানকেই সাতগাঁও জয় করতে পাঠিয়েছিলেন। জাফর খান প্রথমেই কিছু সাফল্য লাভ করেন এবং সাতগাঁও–এ একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সাতগাঁও এলাকা জয় করতে তাঁর আরও কিছুদিন সময় লাগে। অন্ততঃ ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই তিনি সাতগাঁও বিজয় সম্পূর্ণ করেন। এই সময়ে 'দার-উল-খয়রাত' নামে একটি মাদ্রাসা তৈরি করেন বা পূর্বের মাদ্রাসাকে তিনি পরিবর্ধিত করেন। শাহ সফিউদ্দিনও জাফর খানকে সাতগাঁও বিজয়ে সাহায্য করেন। অবশ্য শাহ সফিউদ্দিনের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ প্রথমে সংঘটিত হয় কিনা বলা যায়না। তবে, বাংলায় ইসলাম প্রচারে সুফিদের ভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সুফিরা প্রথমে ধর্ম প্রচারে বের হতেন। তাঁরা হিন্দুদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। শাহ সফিউদ্দিনের সম্পর্কে জনশ্রুতিতে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুলতান ফিরোজ শাহের পক্ষে জাফর খানই শাহ সফিউদ্দিনকে সাহায্য করেন। পরে জাফর খানের মৃত্যু হলে প্রথম মুসলমান বিজয়ী হিসেবে লোকস্মৃতিতে দরবেশে পরিণত হয়ে জাফর খান গাজি রূপে খ্যাতি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং শামসউদ্দিন

ফিরোজ শাহের সিংহাসন আরোহণের সময় জাফর খান তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বলে বিনিময়ে ফিরোজ শাহ তাঁকে 'খান জাহান মুঈন-উল-মুলক ওয়াল সালাতীন' উপাধি দেন।

ময়মনসিংহ জয়

ফিরোজ শাহের ময়মনসিংহ বিজয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর ছেলে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর গিয়াসপুর টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন। গিয়াসপুরকে ময়মনসিংহের প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ঐ নামের একটি গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। তাছাড়া ফিরোজ শাহ কর্তৃক সিলেট বিজয়ের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং সিলেট জয়ের আগে তিনি ময়মনসিংহও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।

সিলেট জয়

সিলেটে শাহজালালের দরগাহে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সময়ে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিজিত হয়। সাতগাঁও বিজয়ের সঙ্গে যেমন জাফর খান গাজি এবং শাহ সফিউদ্দিনের নাম যুক্ত, তেমনি সিলেট বিজয়ের সঙ্গেও শাহজালাল ও নাসিরউদ্দিনের নাম জড়িত। কথিত আছে যে, বুরহানউদ্দিন নামক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সিলেটের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বাস করতেন। ঐ সময়ে গৌর গোবিন্দ ছিলেন সিলেটের রাজা। বুরহানউদ্দিন তাঁর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে একটি গরু জবেহ্ করেন। ঘটনাক্রমে একটি চিল এক টুকরো মাংস নিয়ে সিলেটের রাজা গৌর গোবিন্দের মন্দিরে নিক্ষেপ করে। এতে রাজা গৌর গোবিন্দ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এবং অনেক অনুসন্ধানের পর বুরহানউদ্দিনকে ধরে তাঁর ডান হাত কেটে দেন ও তাঁর পুত্রকে হত্যা করেন। বুরহানউদ্দিন অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের শরণাপন্ন হলেন এবং গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সুলতান তাঁর ভাগ্নে সিকান্দার খান গাজিকে সসৈন্যে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সিকান্দার খান গাজি দুবার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। এ সময় শাহজালাল তুরস্কের কুনিয়া শহর হতে ৩১৩ জন শিষ্যসহ বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমে সাতগাঁও-এ আসেন এবং পরে সিলেটের দিকে রওয়ানা হয়ে সিকান্দার খান গাজির সঙ্গে যোগ দেন। সৈয়দ নাসিরউদ্দিনকে তাঁর শিষ্যদের সিপাহ্সালার বা সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। রাজা গৌর গোবিন্দ এবার আর বাঁধা দিতে পারলেন না। তিনি সিলেট ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন এবং সিলেট মুসলমানদের অধিকারে আসে। শাহজালাল মৃত্যু অবধি সিলেটে অবস্থান করেন এবং তিনিই ঐ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের অগ্রনায়ক। বুরহানউদ্দিন কর্তৃক গরু জবেহ্র কাহিনী কতখানি সত্য তা বলা যায় না। কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সিলেট জয়ের সাথে শাহজালাল জড়িত ছিলেন এবং শিলালিপি প্রমাণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার মুসলিম রাজ্যের এই বিস্তৃতি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফিরোজ শাহ এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বাংলার মুসলিম রাজ্য রক্ষা করেছিলেন। তিনি কোন রাজবংশজাত লোক ছিলেন না। কিন্তু একজন দক্ষ সেনাপতি হিসেবে তিনি বলবন বংশের সেবা করেন এবং দিল্লির খলজীদের আক্রমণ হতে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে রক্ষা করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি মুসলিম রাজ্য চতুর্দিকে বৃদ্ধি করেন এবং প্রত্যন্ত এলাকা ছাড়া বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরোজ শাহের আমলে শুধু যে মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ঘটে তাই নয় বরং বাংলায় ইসলাম প্রচারও বৃদ্ধি পায়। সাতগাঁও এবং সিলেট বিজয়ের সঙ্গে দুজন বিখ্যাত সুফির নাম জড়িত। শাহ সফিউদ্দিনের প্রচারের ফলে সাতগাঁও এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সিলেটে শাহজালালের (রা:) প্রভাব এখনও লক্ষণীয়। এমনকি সারা বাংলাদেশে শাহজালালের (রা:) প্রভাব রয়েছে। বাংলায় ফিরোজ শাহের নাম খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলার দুটি শহর ফিরোজ শাহের নাম বহন করে ঃ মালদহ জেলার পান্ডুয়া এবং হুগলী জেলার পান্ডুয়া। তাঁর নামানুসারে দুটি শহরের নামকরণ করা হয়েছিল ফিরোজাবাদ। দুর্ভাগ্যবশত,

শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের সমসাময়িক কোন ইতিহাস এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। পরবর্তী ইতিহাসেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মুদ্রা এবং শিলালিপির ভিত্তিতেই তাঁর ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা হয়। সমসাময়িক ইতিহাস পাওয়া গেলে এই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কূটনীতিবিদ সুলতান সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হতো। তবে বাংলার মুসলিম রাজ্য বিস্তারে এবং এর সুপ্রতিষ্ঠায় তাঁর যে বিশেষ ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং বাংলায় স্থায়ীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত হয়ে থাকবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলার ইতিহাসে ১৩০০ থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল গুরুত্বপুর্ণ। শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ এ সময়কালের প্রথমদিকে রাজত্ব করেন। তিনি সম্ভবত কায়কাউসকে অপসারিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ফিরোজ শাহ সমগ্র বাংলাকে মুসলিম অধিকারে আনেন। তাঁর আমলে ইসলাম প্রচারও বৃদ্ধি পায়। ফিরোজাবাদ তাঁরই নামের স্মৃতিবাহী শহর। ফিরোজ শাহের রয়েছে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে মর্যাদাপূর্ণ স্থান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল ছিল–

(ক) ১৩০৩ থেকে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (খ) ১৩০১ থেকে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

(গ) ১৩০২ থেকে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (ঘ) ১৩০০ থেকে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

২। 'দার-উল-খয়রাত' মাদ্রাসা নির্মিত হয়–

(ক) ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩১২ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে।

৩। রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে ফিরোজ শাহ কোথায় যুদ্ধ করেন?

(ক) ময়সনসিংহে (খ) সাতগাঁও

(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) সিলেট।

৪। বাংলার স্বাধীন সুলতানি শুরু হয় কত সালে?

(ক) ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ বলবন বংশসম্ভূত ছিলেন না– ব্যাখ্যা করুন।

২। গৌর গোবিন্দ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

২। সাতগাঁও এবং সিলেট জয়ের বিশেষ উল্লেখপূর্বক ফিরোজ শাহের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আবদুলকরিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানি আমল।*
২। Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal,* Vol.II
৩। আবদুলমমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)।*

পাঠ - ৩

স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা ঃ ইলিয়াস শাহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার পটভূমি জানতে পারবেন ;
- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- ইলিয়াস শাহের উত্থান এবংকৃতিত্ব বিষয়ে ধারণা পাবেন ;
- শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার পটভূমি

শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর কর্তৃক সিংহাসন অধিকার তাঁর ভাইদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সর্বকনিষ্ঠ ভাই নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই আহ্বানে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলাকে পদানত করার সুযোগ পেলেন। তিনি সুযোগের পূর্ণসদ্ব্যবহার করে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতি আগমন করেন। লখনৌতিতে পৌঁছাবার পূর্বে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ত্রিহুত জয় করেন ও সেখানে নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাঁর পালকপুত্র বাহরাম খানের নেতৃত্বে লখনৌতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর পরাজিত হন এবং পালিয়ে পূর্ব বাংলার দিকে যাবার সময় ধরা পড়েন। বাংলার মুসলিম রাজ্যের ওপর পুনরায় দিল্লির শাসন প্রবর্তিত হয়।

বাংলা ত্যাগ করার পূর্বে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলার মুসলিম রাজ্যকে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হলো লখনৌতি। তিনি নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমকে এই বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শাসনকেন্দ্র স্থাপন করা হল সাতগাঁও-এ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করা হলো সোনারগাঁও-এ। উভয় বিভাগের যুক্ত শাসনভার অর্পণ করা হয় সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পালক পুত্র বাহরাম খানের ওপর। এভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লির উদ্দেশ্যে লখনৌতি ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি দিল্লিতে পৌঁছাতে পারেননি। দিল্লির অদূরে আফগানপুরের দুর্ঘনায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যু হয়।

নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম কয়েক বৎসর দিল্লির অধীন শাসনকর্তা হিসেবে লখনৌতি শাসন করেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজ্যভার গ্রহণ করার অল্পকাল পরেই শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন করেন। তিনি গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে মুক্তি দেন ও তাঁকে সোনারগাঁও-এর বাহরাম খানের সাথে যুগ্ম শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। যুগ্ম শাসনকর্তা নিয়োগের মূল কারণ এই ছিল যে, একজন অপরজনকে দমিয়ে রাখতে পারবে। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক লখনৌতি এবং সাতগাঁও কেন্দ্রেও শাসনকর্তা পরিবর্তন করেন। লখনৌতিতে পাঠানো হয় মালিক পিন্দর খলজীকে এবং সাতগাঁওতে পাঠানো হয় ইজ্জ্উদ্দিন ইয়াহিয়াকে। এভাবে বাংলার তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিয়োগ করে হয়তো সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বিদ্রোহের আশঙ্কা দূর করতে চেয়েছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর দিল্লির আনুগত্য মেনে কিছুদিন শাসন করেন। তিনি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নামে ৭২৮ হিজরিতে (১৩২৭-২৮ খ্রি:) মুদ্রা জারি করেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিয়োগের অন্য শর্ত অর্থাৎ পুত্রকে দিল্লিতে প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। এই বিষয়ে দিল্লির সুলতান চাপ দিলে তিনি ঐ বৎসরই অর্থাৎ ৭২৮ হিজরিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৭২৮ হিজরিতে স্বনামে মুদ্রা জারিই তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রমাণ করে। বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথেই বাহরাম খান তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। বাহাদুর পরাজিত ও নিহত হন।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

বাহরাম খান যতদিন বেঁচে ছিলেন বাংলায় সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসন তেমন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যু হলে তাঁর সিলাহদার (বর্মরক্ষক) ফখ্‌রা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁও-এর সিংহাসন অধিকার করেন। ফখরুদ্দিন কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণাই বাংলায় স্বাধীন সুলতানির সূচনা করে। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সেই সময় তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় সুদূর বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেননি। তাই এর পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহ বাংলার স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখে এবং ধীরে ধীরে সোনারগাঁও ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রেও স্বাধীনতার সূচনা করে।

ফখরুদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান ও সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দিন ইয়াহিয়া মিলিতভাবে সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। ফখরুদ্দিন পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কদর খান বহু ধনসম্পদ ও হাতি ঘোড়া হস্তগত করে সোনারগাঁও অধিকার করেন ও সেখানে থেকে যান। ফখরুদ্দিন বর্ষার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। বর্ষাকালে তিনি পাল্টা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কদর খান পরাজিত ও নিহত হন। ফখরুদ্দিন সোনারগাঁও পুনরুদ্ধার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে, ৭৩৯ হিজরি (১৩৩৮ খ্রি:) হতে ৭৫০ হিজরি (১৩৪৯ খ্রি:) পর্যন্ত ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁও-এ রাজত্ব করেন।

কদর খানের মৃত্যুর পর লখনৌতিতে তাঁর সেনাধ্যক্ষ (আরিজ) আলী মোবারক সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান ফখরুদ্দিন মুখলিস নামক তাঁর এক সেনাপতিকে লখনৌতি আক্রমণ করতে পাঠান। কিন্তু আলী মোবারক তাকে পরাজিত করেন। এরপর প্রায় প্রতি বছরই সোনারগাঁও ও লখনৌতির মধ্যে যুদ্ধ লেগে ছিল। কিন্তু সুলতান ফখরুদ্দিনের লখনৌতি অধিকারের চেষ্টা সফল হয়নি। ৭৪৩ হিজরিতে (১৩৪২ খ্রি:) ইলিয়াস শাহ লখনৌতি অধিকার করেন।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়ই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম অঞ্চল মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। শিহাবউদ্দিন তালিশ তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন যে, ফখরুদ্দিন চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ তৈরি করেছিলেন। ফখরুদ্দিন ৭৫০ হিজরি (১৩৪৯ খ্রি:) পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং পরবর্তী সুলতান খুব সম্ভবত তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন গাজি শাহ ৭৫৩ হিজরি (১৩৫২ খ্রি:) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে মুদ্রা প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রমাণে একথাও বলা যায় যে, ঐ বৎসরই (১৩৫২ খ্রি:) ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করেন।

ইবনে বতুতা

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজত্বকালে ১৩৪৫-৪৬ খ্রি: মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় আসেন। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহ সফর করে তিনি প্রথমে দিল্লি ও পরে দিল্লি হতে বাংলায় আসেন। তাঁর বাংলায় আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল সিলেট গিয়ে হযরত শাহজালালের (রা:) সাথে সাক্ষাত করা। সিলেটে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি নদীপথে সোনারগাঁও আসেন এবং সেখান থেকে চীনা নৌযান যোগে জাভার পথে যাত্রা করেন।

ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে তদানীন্তন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। বাংলার প্রাচুর্য ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ইবনে বতুতাকে অবাক করেছিলেন। তিনি বাংলার খাদ্য সামগ্রীর অল্পমূল্যে ও সল্পব্যয়ে জীবন যাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার বাংলাদেশের হাট-বাজারে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও এক স্বর্ণ দিনার দিয়ে আশুরা নামে একজন সুন্দরী দাসী ক্রয় করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। দেশে সুফি সাধক ও ফকিরদের বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্যাদির প্রাচুর্য ও স্বল্পমূল্য আর মনোরম প্রাকৃতিক

দৃশ্যাবলী ইবনে বতুতাকে আকৃষ্ট করলেও এদেশের আবহাওয়া তাঁর পছন্দ হয়নি। অতিবৃষ্টি ও তার ফলে আর্দ্রতা, বর্ষাকালের কর্দমাক্ত পথঘাট এবং বন্যাজনিত প্লাবনকে তিনি পছন্দ করতে পারেননি। তাই তিনি বাংলাকে 'দোজখপুর-আয-নিয়ামত' বা ধনসম্পদে পূর্ণ নরক বলে অভিহিত করেছেন।

ইলিয়াস শাহের উত্থান

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে হাজী ইলিয়াস 'সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ' উপাধি ধারণ করে ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। উল্লেখ্য যে, আলাউদ্দিন আলী শাহ লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করে তাঁর রাজধানী ফিরোজাবাদে (পান্ডুয়া) স্থানান্তরিত করেন। ৭৪২ ও ৭৪৩ হিজরিতে (১৩৪১–৪২ খ্রিঃ) ফিরোজাবাদ টাকশাল হতে জারিকৃত তাঁর মুদ্রা পাওয়া যায়। একই টাকশাল হতে ৭৪৩ হিজরিতে মুদ্রিত ইলিয়াস শাহের মুদ্রাও পাওয়া গেছে। তাই বলা যায়, আলী শাহকে অপসারিত করে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে হাজী ইলিয়াস ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের পূর্ব পরিচয় বা প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে ঐক্য না থাকায় সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। আরবের দুজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে হজর এবং আল-সাখাওয়াভীর মতে তিনি পূর্ব ইরানের সিজিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। সেখান হতে তিনি বা তাঁর পরিবার কিভাবে এই উপমহাদেশে এসেছিলেন তার কোন উল্লেখ নেই। গোলাম হোসেন সলিম রচিত "রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে তাঁর বাংলায় আগমনের কাহিনী বর্ণিত আছে। আলী মোবারকের (যিনি লখনৌতিতে আলাউদ্দিন আলী শাহ উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন) ধাত্রীপুত্র বা দুধ ভাই ছিলেন হাজী ইলিয়াস। উভয়েই দিল্লিতে মালিক ফিরোজ বিন রজবের (পরে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক নামে খ্যাত) অধীনে চাকুরি করাকালীন হাজী ইলিয়াস কোন অপকর্ম করে পালিয়ে যান। মালিক ফিরোজ ইলিয়াসকে ধরে আনার জন্য আলী মোবারককে আদেশ দেন। আলীমোবারক ইলিয়াসকে ধরে আনতে ব্যর্থ হলে মালিক ফিরোজ তাঁকেও তাড়িয়ে দেন।আলী মোবারক বাংলায় চলে আসেন এবংলখনৌতির শাসনকর্তা কদর খানের অধীনে চাকুরি গ্রহণকরেন। পরে তিনি আলাউদ্দিন আলী শাহ উপাধি গ্রহণ করে লখনৌতির ক্ষমতা দখলকরেন। কিছুদিন পর হাজী ইলিয়াস বাংলায় আসলে আলী মোবারক তাঁকে বন্দি করেন। ইলিয়াসের মাতার অনুরোধে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় ও পরে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা হয়।

হাজী ইলিয়াস অল্পদিনের মধ্যেই আলী মোবারকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং সৈন্যবাহিনীকে নিজের পক্ষে টেনে নেন। খোজাদের সাহায্যে আলী মোবারককে হত্যা করে তিনি নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন ও সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করেন। বুকাননের পান্ডুলিপিতে এই কাহিনীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তবে এই কাহিনীর সত্যতা নিরূপণ সম্ভব নয়। তাঁর নামের পূর্বে হাজী উল্লেখ থাকায় মনে হয় তিনি আগেই হজ্ব করেছিলেন।

ইলিয়াস শাহ ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকার করে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলার অধীশ্বর হলেন। কিন্তু পূর্ব বাংলা (যার কেন্দ্র সোনারগাঁও) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা (যার কেন্দ্র সাতগাঁও) তখনও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়নি। এই দুই অঞ্চলে সে সময়ে যথাক্রমে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ও দিল্লির শাসন চলছিল। খুব সম্ভবত ইলিয়াস শাহ প্রথমে সাতগাঁও-এর দিকে রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। ৭৪৭ হিজরিতে (১৩৪৬ খ্রিঃ) সাতগাঁও টাকশাল হতে প্রকাশিত তাঁর মুদ্রা পাওয়া যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে ইলিয়াস শাহ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন।

এরপর ইলিয়াস শাহ পূর্ব বাংলার দিকে রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা না করে পশ্চিম দিকে মনোনিবেশ করেন। খুব সম্ভবত নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা জয় সহজসাধ্য হবে না বলে এবং সেখানে ফখরুদ্দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন বহাল থাকায় তিনি সেই দিকে নজর দেননি। তাই পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যজয়ে সচেষ্ট হন।

নেপাল আক্রমণ

১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক নেপালে অভিযান প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। নেপাল রাজবংশাবলীতে ৪৬৯ নেওয়ারী সম্বৎ-এ (১৩৪৯ খ্রিঃ) পূর্ব দেশীয় সুলতান শামসউদ্দিনের নেপাল আক্রমণের উল্লেখ আছে। কাঠমন্ডুর নিকটস্থ স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে এই আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই লিপিতে আক্রমণের তারিখ ৪৭০ নেওয়ারী সম্বৎ (১৩৫০খ্রিঃ) বলে উল্লেখ আছে। এই আক্রমণের কোন বিস্তারিত বিবরণ কোন সূত্রে নেই। এই আক্রমণের ফলে ইলিয়াস শাহ স্বরাজ্যসীমা বৃদ্ধি না করলেও প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

নেপাল জয়ের পূর্বেই হয়তো ইলিয়াস শাহ ত্রিহুতের (উত্তর বিহার অঞ্চল) কিছু অংশ জয় করেন। সেখানে হিন্দু রাজবংশে অন্তর্বিরোধের সুযোগে ইলিয়াস শাহ খুব সম্ভবত এ অঞ্চলে কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

সোনারগাঁও জয়

১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ পূর্ব বাংলার দিকে সাফল্যজনক অভিযান করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সোনারগাঁও-এ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের পর সুলতান ইখতিয়ারউদ্দিন গাজি শাহ রাজত্ব করেন ৭৫০ হিজরি হতে ৭৫৩ হিজরি (১৩৪৯–১৩৫২ খ্রিঃ) পর্যন্ত। ৭৫৩ হিজরিতেই (১৩৫২ খ্রিঃ) ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ বৎসরে সোনারগাঁও টাকশাল হতে জারিকৃত তাঁর মুদ্রা হতে। সোনারগাঁও অধিকারের পর তিনি সমগ্র বাংলার অধিপতি হন। ইতোপূর্বে বাংলার অন্য কোন মুসলমান সুলতান সমগ্র বাংলার সুলতান হবার গৌরব লাভ করতে পারেননি। এ কারণেই হয়তো ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ ইলিয়াস শাহকে "শাহ-ই-বাঙালাহ্' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

সমগ্র বাংলা অধিকারের ফলে ইলিয়াসের শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। তিনি রাজ্যসীমা বাংলার বাইরে বৃদ্ধিকল্পে অভিযান প্রেরণ করার মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। "তারিখ-ই-ফিরিশতা" ও "তাবাকাৎ-ই-আকবরী"র সাক্ষ্যে মনে হয় ইলিয়াস শাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেছিলেন। তিনি চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ৪৪টি হাতিসহ প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করেছিলেন। এই সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ বিহার আক্রমণ করেন। দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সে সময় সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আক্রমণ করা খুবই স্বাভাবিক। ত্রিহুত আক্রমণ এই সময়ে সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়।

বিহারের সাফল্য ইলিয়াস শাহের উদ্যম ও অভিলাষ বৃদ্ধি করে। তিনি আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করে এক বিরাট ভূ-খন্ড রাজ্যভুক্ত করেন এবংবাহরাইচের শেখ মাসুদ গাজির সমাধিতে গিয়ে দুবার নিজের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

ফিরোজ তুঘলকের বাংলা অভিযান

তবে ইলিয়াস শাহের এই সাফল্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে বাংলা আক্রমণ করেন। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি এই অভিযান শুরু করেন এবং ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরোজ তুঘলকের বাংলা অভিযানের বিবরণ বারাণীর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, অফিফের তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ও সিরাত-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে পাওয়া যায়। এসব সমসাময়িক সূত্রে কিছু কিছু বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে যুদ্ধের বিবরণ প্রায় একই রকম। তবে জায়গায় জায়গায় দিল্লির ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর সঙ্গে নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। অযোধ্যা, চম্পারণ ও গোরক্ষপুরের ভিতর দিয়ে কুশী নদী অতিক্রম করে ফিরোজ বাংলায় আসেন। ফিরোজ শাহের আগমনের খবর পেয়ে ইলিয়াস শাহ সীমান্তে বাধা প্রদানের কোন প্রকার চেষ্টা না করে ত্রিহুতের দিকে চলে আসেন এবং পরে ত্রিহুত ত্যাগ করে রাজধানী ফিরোজাবাদে (পান্ডুয়া) আসেন। দিল্লি বাহিনী

নিকটবর্তী হলে ইলিয়াস শাহ রাজধানী প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করেই একডালা দুর্গেআশ্রয় নিলেন এবংআত্মরক্ষার প্রস্তুতি করতে লাগলেন। একডালা দুর্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। তবে বর্তমানে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, এই দুর্গ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ধনজর পরগণাস্থ একডালা গ্রামে অবস্থিত ছিল। মনে করা হয় যে, একডালা দুর্গ বিরাট এলাকা জুড়ে কাদামাটির দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং অন্যদিকে ছিল ঘন অরণ্য। ইলিয়াস শাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জল ও জঙ্গল ঘেরা একডালা দুর্গ জয় করতে দিল্লির সৈন্যদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে এবং বর্ষাকালে এই রকম অঞ্চলে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম।

অতি সহজে ফিরোজ শাহ পান্ডুয়া দখল করলেন। পান্ডুয়া দখলের পর সুলতান ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু জল বেষ্টিত কাদামাটি দ্বারা প্রস্তুত এই দুর্গটি জয় করা ফিরোজ শাহের সৈন্যদের পক্ষে সহজ বলে প্রতীয়মান হল না। ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গের অভ্যন্তর হতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে লাগলেন এবং বর্ষাকাল পর্যন্ত দিল্লির সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখলেন। তিনি জানতেন বর্ষাকালের প্রবল বৃষ্টিপাত এবং মশার দংশন দিল্লির সৈন্যগণ সহ্য করতে পারবে না এবং বাংলা জয়ের আশা ত্যাগ করে ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

উভয়পক্ষের মধ্যে ছোট ছোট খন্ডযুদ্ধ হয়। কিন্তু সেগুলোর তেমন কোন চূড়ান্ত ফলাফল ছিল না। এদিকে বর্ষাকাল সমাগত প্রায়। ফিরোজ শাহের সৈন্যরা বাংলার অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং মশার আক্রমণে অসহ্য যন্ত্রণার কবলে পড়ল। একদিন সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁর সৈন্যদেরকে শিবির তুলে নিতে আদেশ করেন। ফিরোজ শাহের সৈন্যদল পশ্চাদপসারন করেছে ভেবে ইলিয়াস শাহ তাঁর সৈন্যদল সহ দুর্গের বাইরে চলে আসেন এবং দিল্লির বাহিনীকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করেন। ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ হতে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিলেন এবং ইলিয়াস শাহের আসার সংবাদ পেয়ে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধের জায়গায় সারিবদ্ধ করেন। উভয়পক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। ইলিয়াস শাহ তেমন সাফল্য অর্জন করতে না পেরে পুনরায় একডালায় আশ্রয় নেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একডালা দুর্গ দখল করার জন্য পুনরায় অবরোধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তেমন কোন চূড়ান্ত ফলাফলের আশা না থাকায় উভয় পক্ষ সন্ধিতে সম্মত হয়। ইলিয়াস শাহের সাথে সন্ধি স্থাপন করে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দিলি-তে ফিরে যান, পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে দূত ও উপহার বিনিময় হয়।

ত্রিপুরা ও কামরূপ অভিযান

ইলিয়াস শাহ এর পর বিনা বাঁধায় আরো কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। এসময় তিনি রাজ্য বিস্তারেও প্রয়াসী হন। এবার তিনি পূর্ব সীমান্তে মনোযোগ দেন। তিনি এ সময় ত্রিপুরা রাজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজত্বের শেষদিকে কামরূপরাজকে পরাজিত করে কামরূপের কিছু অংশ জয় করেছিলেন বলে মনে হয়। সিকান্দর শাহের রাজত্বের শুরুতেই অর্থাৎ ৭৫৯ হিজরিতে জারিকৃত একটি মুদ্রার টাকশালের নাম 'আওয়ালিস্তান ওরফে কামরু' পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় সিকান্দর শাহের রাজত্বের শুরু থেকেই কামরূপ বা তার কিয়দংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিকান্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপ জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিকদের ধারণা, সুলতান ইলিয়াস শাহই কামরূপের কিছু অংশ জয় করেছিলেন।

কিভাবে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয় সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। সিরাত-ই-ফিরোজ শাহী, তারিখ-ই-মোবারকশাহী ও রিয়াজ-উস-সালাতীন-এর মতে ৭৫৯ হিজরিতে (১৩৫৮ খ্রি:) ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়। মুদ্রা প্রমাণে এই তথ্য সত্য বলে মনে হয়। ৭৫৮ হিজরি পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া গেছে এবং ৭৫৯ হতে তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়।

মূল্যায়ন

সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের নাম বাংলার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। তিনি নিঃসন্দেহে একজন উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সমরনায়ক হিসেবেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সামান্য অবস্থা হতে স্বীয় বুদ্ধি ও সমরনীতির গুণে তিনি বাংলায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। মুসলমান সুলতানদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সমগ্র বাংলাকে এক শাসনাধীনেই আনেননি, পশ্চিম সীমান্তে সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করে তিনি ত্রিহুত, নেপাল, উড়িষ্যায় সাফল্যজনক অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি দিল্লি সাম্রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার মতো ক্ষমতা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিহার জয় করে তিনি চম্পারণ, কাশী ও গোরক্ষপুর পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণকালে তিনি একডালা দুর্গে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। ফিরোজ শাহের সাথে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সঠিক না জানা গেলেও এটা স্পষ্ট যে, ফিরোজ শাহ তাঁকে পদানত করতে পারেননি। বরঞ্চ সন্ধি স্থাপন করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহ তারপর যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন উভয়ের মধ্যে উপঢৌকন বিনিময় হয়েছে। দিল্লির আক্রমণ প্রতিহত করার পর ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে আমরণ মিত্রতা রক্ষা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন এবং কামরূপ রাজ্যের কিছু অংশ জয় করেছিলেন বলে মনে হয়। সুতরাং তাঁর অধীন বাংলায় যে নতুন উদ্যম সঞ্চারিত হয়েছিল তার প্রভাব কেবল মাত্র বাংলার পশ্চিম সীমান্তেই পড়েনি, পূর্ব সীমান্তেও পড়েছিল।

ইলিয়াস শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি সুফি ও দরবেশদের খুব সম্মান করতেন। বিশিষ্ট সুফি শাহ শায়খ আলাউল হকের সম্মানে তিনি একটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীন-এ বলা হয়েছে যে, ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক একডালা দুর্গ অবরোধকালে শায়খ বিয়াবানীর মৃত্যু হয়। ইলিয়াস শাহ তাঁকে এতই ভক্তি করতেন যে, তিনি নিজের জীবনের প্রতি খেয়াল না করে ছদ্মবেশে দুর্গের বাইরে আসেন এবং শায়খ বিয়াবানীর দাফনে যোগদান করেন।

স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহ বাংলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সমগ্র বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি রাজ্যসীমা ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দিল্লির আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে তিনি শৌর্য ও বীর্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দিল্লির সাথে সৌহার্দ্য বজায় রেখে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি দিল্লির ঐতিহাসিকদের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ফলে তাঁর কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, তবে নিঃসন্দেহে তাঁর পনর বৎসরের শাসন তাঁর যোগ্যতারই পরিচয় বহন করে।

সারসংক্ষেপ

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানির সূচনা করেন। ক্রমে সোনারগাঁও ছাড়াও অন্যান্য কেন্দ্রেও স্বাধীনতার সূচনা হয়। ফখরুদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলায়আসেন বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা। মধ্যযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় এই পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্তে। তিনি বাংলাকে বলেন 'ধনসম্পদে পূর্ণ নরক'। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহই সর্বপ্রথম সমগ্র মুসলিম বাংলাকে এক শাসনের অধীনে আনেন। তিনি নেপাল, সোনারগাঁও, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন। দিল্লির সমকালীন ঐতিহাসিক তাঁকে 'শাহ-ই-বাঙালাহ্' উপাধিতে ভূষিত করেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলা আক্রমণকরলে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ তাঁকে পদানত করতে পারেননি। উভয়ের মধ্যেসন্ধি স্থাপিত হয়। এরপর ত্রিপুরা ও কামরূপেও তাঁর অভিযান চলে। স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইলিয়াস শাহ ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কার সময়ে মুসলিম বাংলা সুস্পষ্টভাবে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ হয়?
   (ক) মুহাম্মদ বিন তুঘলক (খ) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
   (গ) বলবন (ঘ) আলাউদ্দিন খলজী।

২। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ কোন প্রশাসনিক কেন্দ্রে স্বাধীনতার সূচনা করেন?
   (ক) সাতগাঁও (খ) সোনারগাঁও
   (গ) লখনৌতি (ঘ) ফিরোজাবাদ।

৩। ইলিয়াস শাহ কোন সময়ে সোনারগাঁও অভিযান করেন?
   (ক) ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে
   (গ) ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে।

৪। একডালা দুর্গকোথায় অবস্থিত?
   (ক) দিনাজপুরে (খ) পান্ডুয়ায়
   (গ) চট্টগ্রামে (ঘ) সিলেটে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বাংলা অভিযানের বর্ণনা দিন।

২। একডালা দুর্গ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

২। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের উত্থান আলোচনা করুন। কেন তাঁকে বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?

৩। বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইলিয়াস শাহের অবদান মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানের আমল।*

২। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানি আমল।*

৩। J.N. Sarkar (ed), *History of Bengal,* Vol-2.

৪। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠ - ৪

বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসন ঃ আযম শাহ, রাজা গণেশ ও পরবর্তী ইলিয়াস শাহীসুলতান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসনের সামগ্রিক চিত্র পাবেন ;
- গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- রাজা গণেশ-এর শাসনকাল সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- পরবর্তী ইলিয়াশাহী যুগ সম্পর্কে তথ্যপাবেন ;
- ইলিয়াসশাহী যুগের কৃতিত্ব ও গৌরব সম্পর্কে জানবেন।

সুলতান সিকান্দার শাহ

সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালের কিছু মুদ্রা ও কয়েকটি শিলালিপি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর রাজত্বের প্রারম্ভে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক দ্বিতীয় বার বাংলা আক্রমণ এবং এই প্রসঙ্গে দিল্লির ঐতিহাসিকদের লেখনিতে সিকান্দর শাহের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ফিরোজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লির সাথে বাংলার সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কছেদ ঘটে। ফলে এরপর বাংলা সম্বন্ধে দিল্লির ঐতিহাসিকদের তেমন কোন সম্যক জ্ঞান ছিল না।

সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রথম বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু তেমন কোন সাফল্য অর্জন না করে ফিরে যান। ইলিয়াস শাহের জীবিতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে মিত্রতা বজায় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে একাধিকবার উপঢৌকন বিনিময় হয়েছিল। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর সময় ফিরোজ শাহের দূত উপহার নিয়ে বাংলা আসার পথে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু সংবাদ পান, ফলে তিনি বাংলায় না এসে দিল্লিতে ফিরে যান। তদুপরি সিকান্দর শাহের সিংহাসন আরোহণের পর পরই ফিরোজ শাহ বাংলার বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। দিল্লির সুলতান সম্ভবত ইলিয়াস শাহের রাজত্বের অবসানের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই সিকান্দার শাহের রাজত্বের প্রারম্ভেই বাংলায় দিল্লির শাসন পুন:প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় মনে করে কাল বিলম্ব না করে তিনি আবার বাংলা আক্রমণ করেন।

প্রথমবারের মতো এবারও ফিরোজ শাহ এক বিরাট সৈন্যদল ও নৌবহর সঙ্গে নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। কনৌজ, অযোধ্যা ও জৌনপুর হয়ে ফিরোজ শাহ বাংলায় এসে পৌঁছালে সুলতান সিকান্দার শাহ তাঁর পিতার পথ অনুসরণ করে দুর্ভেদ্য ও জলেবেষ্টিত একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অবরোধ করেন এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ বিরক্ত হয়ে সন্ধির জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন এবং অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ফিরোজ শাহ ৮০,০০০ টাকা দামের একটি মুকুট এবং ৫০ আরবি ও তুর্কি ঘোড়া সিকান্দার শাহকে উপহার দেন। সুলতান সিকান্দার শাহ ফিরোজ শাহকে চল্লিশটি হাতি এবং আরো নানা মূল্যবান উপহার পাঠান যতদিন ফিরোজ শাহ ও সিকান্দার শাহ বেঁচে ছিলেন, ততদিন উভয়ের মধ্যে উপহার বিনিময় চলেছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থ হয়েছিল। বরং সিকান্দার শাহ তাঁর নিকট হতে স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি হিসেবে স্বীকৃতি

আদায় করে নিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় অভিযান ৭৫৯ হিজরিতে শুরু হয়েছিল এবং দুই বৎসর সাত মাস চলেছিল।

সিকান্দার শাহের দীর্ঘ রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণ ব্যতিত অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কে তেমন কোন কিছু জানা যায় না। এ পর্যন্ত তাঁর শাসনকালের তিনটি শিলালিপি ও বেশ কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপি থেকে বোঝা যায় তিনি মুসলমান সুফি সাধকদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তিনি ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার দেবকোর্টে মোল্লা আতার দরগায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে। পান্ডুয়ায় শায়খ আলাউল হক তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর সাথে বিহারের মনে এর বসবাসকারী শায়খ শরফউদ্দিন ইয়াহিয়া মনেরীর সৌহার্দ ও পত্রালাপ ছিল। কথিত আছে শায়খ আলাউল হকের প্রতি তাঁর প্রথমে অতীব ভক্তি থাকলেও পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল।

সুলতান সিকান্দার শাহ শিল্পানুরাগী ও শিল্প স্রষ্টা ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর অমর কীর্তি পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ। ১৩৪৬ হতে ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি নির্মিত হয়। আয়তনের বিশালতায় ও উচ্চমানের কারুকার্যের জন্য এই মসজিদটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। বিশালাকার এই মসজিদটি ছিল দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০৭ ফুট ও প্রস্থে প্রায় ২৮৫ ফুট। মসজিদের অঙ্গসজ্জায় বাংলাদেশের সনাতন পোড়ামাটির শিল্পের ব্যবহার একে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করেছে। তবে এত বড় স্থাপত্য নির্মাণে বাংলাদেশের কারিগরদের অদক্ষতার কারণে মসজিদটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে এটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। পশ্চিমদিকের কিছু অংশ এখনও এর অবস্থানের চিহ্ন বহন করছে।

মুদ্রা ও শিলালিপিতে সুলতান সিকান্দর শাহ কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাধি পাওয়া যায়। কোন কোন মুদ্রায় "আল-মুজাহিদ ফি সবিল উর রহমান" (আল্লাহর রাস্তায় যোদ্ধা) বা "ইমাম-উল-আজম" (প্রথম ইমাম) উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। মনে হয় যে, তিনি ধর্ম বিষয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

সিকান্দার শাহের শেষ জীবন সুখে কাটেনি। রিয়াজ-উস-সলাতীন গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিমাতার চক্রান্তে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং পিতা-পুত্রের সংঘর্ষে পিতার মৃত্যু হয়। বুকাননের পান্ডুলিপির বিবরণেও এই তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রমাণে এই ঘটনা সত্য বলে মনে হয়। ৭৫৯ হিজরি থেকে ৭৯১ হিজরি পর্যন্ত জারিকৃত সিকান্দার শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। ৭৯০ হিজরিতে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রা এই বিদ্রোহেরই প্রমাণ বলে মনে করা হয়। সিকান্দর শাহের মৃত্যুর সঠিক তারিখ নিরূপন করা সম্ভব নয়। তবে ৭৯১ হতে ৭৯৫ হিজরির মধ্যবর্তী কোন সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সুলতান হিসেবে গিয়াসউদ্দিন কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রার প্রথম তারিখ ৭৯৫ হিজরি। সুতরাং সিকান্দার শাহের রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে ৭৫৯ হিজরী (১৩৫৮ খ্রিঃ) হতে ৭৯৫ হিজরি (১৩৯৩ খ্রিঃ) পর্যন্ত ধরে নেয়া যেতে পারে।

সিকান্দার শাহের প্রায় ৩৫ বৎসরব্যাপী দীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলার মুসলিম শাসনকালের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণ ব্যতিত অন্য কোন দুর্যোগের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়নি। সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত রাজ্য তিনি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। যদিও উৎসের অভাবে তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতে পারি। তবুও স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ লক্ষ করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর শাসনামলে দেশে সুশাসন ও শান্তি বিরাজিত ছিল। ইলিয়াস শাহ কর্তৃক প্রবর্তিত স্বাধীন সুলতানি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সিকান্দার শাহের শাসনকালে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিমাতার চক্রান্তে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পিতা-পুত্রের সংঘর্ষে সিকান্দার শাহের মুত্যু হলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি বৈমাত্রেয় ভাইদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং তাঁদের অন্ধ করে দেন বা হত্যা করেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তাঁর পিতা ও পিতামহের মত দক্ষ নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে নয়। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষক, সুফি-সাধকদের প্রতি ভক্তি, ইসলামি সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মাদ্রাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কামরূপ আক্রমণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌহাটি যাদুঘরে আজম শাহের একটি শিলালিপি রক্ষিত আছে। অনুমান করা হয় এটি কামরূপের কোন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমরা জানি, সুলতান ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালের শেষের দিকে কামরূপ বিজিত হয়েছিল। এমন হতে পারে যে সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে কামরূপে মুসলমান অধিকার লোপ পায় এবং গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ এই অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। আসাম বুরুঞ্জীতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কর্তৃক কামরূপ আক্রমণ ও বাংলার সুলতানের পরাজয়ের কথা উল্লেখিত আছে। তবে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৩৯৪-৯৫ খ্রি:) লিখিত যোগীনিতন্ত্র নামক গ্রন্থে মুসলমানদের কামরূপ আক্রমণ ও অধিকারের কথা উল্লেখিত আছে। যদিও অসমিয়া সূত্রে তাঁর পরাজয়ের কথা আছে। মুদ্রা ও লিপি তাঁর বিজয় ও অধিকারের কথাই প্রমাণ করে। তবে এই অধিকার বেশিদিন স্থায়ী হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

রিয়াজ- উস-সালাতীন গ্রন্থে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী বর্ণিত আছে। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার সমাদর করতেন। তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন এবং একবার তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানান। রিয়াজ-উস-সালাতীনে কবি হাফিজের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিনের যোগাযোগের একটি কাহিনী পাওয়া যায়। একবার সুলতান ফার্সি ভাষায় একছত্র কবিতা লিখে দ্বিতীয় চরণটি আর রচনা করতে পারলেন না। তখন সুলতান এই চরণটি লিখে একজন দূত মারফত ইরানে কবি হাফিজের নিকট পাঠিয়ে দেন। কবি হাফিজ দ্বিতীয় চরণটি রচনা করেন। সাথে সাথে তিনি একটি গজল রচনা করে বাংলার সুলতানের নিকট পাঠান। সুলতান হাফিজের নিকট বহুমূল্যবান উপহার পাঠালেন। গজলটি "দিওয়ান-ই-হাফিজ" নামে হাফিজের কাব্য সংগ্রহের মধ্যে হুবহু পাওয়া যায়।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মক্কা ও মদিনা শরিফে বহু টাকা ব্যয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেন ও এই দুই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে বিলি করার জন্য বহু অর্থ প্রেরণ করেন। পিতা এবং পিতামহের মতো তিনিও মুসলমান সুফিদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তাঁর সমসাময়িক সুফিদের মধ্যে শায়খ আলাউল হকের পুত্র ও শিষ্য শায়খ নূর কুতুবই আলমের নাম বিখ্যাত। তাঁর ভাই আজম খান মুলতানের উজির ছিলেন। বিহারে শামস্ বলখি নামে আর একজন দরবেশকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন।

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। পারস্যের কবি হাফিজের নিকট দূত প্রেরণ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও যে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজম শাহ জৌনপুরের কাকী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহান মালিক সরওয়ারের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তিনি চীন সম্রাটের সাথেও দূত এবং উপহার বিনিময় করেন। চীনা গ্রন্থের সাক্ষ্যে ১৪০৫, ১৪০৮, ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কর্তৃক চীনে দূত ও উপহার প্রেরণের কথা জানা যায়। চীনা প্রতিনিধি দলের সাথে আগত দোভাষী মা-হুয়ান বাংলা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কর্তৃক প্রকাশিত ৮১৩ হিজরি (১৪১০ খ্রি:) পর্যন্ত মুদ্রা পাওয়া যায়। সুতরাং মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে, তিনি ৭৯৫ হতে ৮১৩ হিজরি (১৩৯৩ -১৪১১ খ্রি:) পর্যন্ত প্রায় ১৮ বছর কাল রাজত্ব করেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনে বলা হয়েছে যে, রাজা কানস্ (সম্ভবত রাজা গণেশ) নামক জমিদারের ষড়যন্ত্রে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ উত্তরাধিকারসূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। এই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে খুব একটা সাফল্য অর্জন না করলেও তিনি তা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। সুশাসক বিদ্যোৎসাহী ও ন্যায়বিচারক হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন।তদানীন্তন ইসলামি বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং চীন দেশের সাথে দূত বিনিময় করে তিনি বাংলার সাথে বহির্বিশ্বের পরিচয় ঘটান।

তিনি ছিলেন আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী। তাঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সেগুলো হতে তাঁকে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়।

মা-হুয়ানের বিবরণ

মা-হুয়ানের বিবরণে তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সুস্পষ্ট চিত্র বিধৃত রয়েছে। এতে বাংলার সামুদ্রিক বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও সমাজ সংস্কৃতির তথ্য পাওয়া যায়। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য পোষাক ও সংস্কৃতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কৃষি প্রধান বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন শস্যের কথা জানা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এদেশে চা উৎপাদিত হতো না, তাই পান দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হতো। দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল কৃষিজীবি। এছাড়া বণিক, জ্যোতিষ, শিল্পী এবং পন্ডিত ছিল। ধনী বণিকরা পণ্য সম্ভার নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতো এবং সে উদ্দেশ্যে বৃহৎ নৌযান নির্মাণ করা হতো শিল্প দ্রব্যের মধ্যে বাংলার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের বেশ প্রশংসা করা হয়েছে। এবং ছয় প্রকার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের উল্লেখ এতে রয়েছে। এ দেশের মুদ্রার নাম ছিল টংকা। তবে সাধারণ বিমিয়ের জন্য কড়ির ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। অপরাধীদের শাস্তির জন্য ভারি বাঁশ নিয়ে প্রহার ও নির্বাসনের প্রচলন ছিল। এদেশের জনসাধারণের ভাষা যদিও ছিল বাংলা, তবে সরকারি কাজকর্ম ফার্সি ভাষায় হতো এবং উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীও ফার্সি ভাষা ব্যবহার করতো। মা-হুয়ান নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুকের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও মা-হুয়ানের বিবরণ অনেকটা সমাজের উচ্চ শ্রেণীভিত্তিক, তথাপি পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য একান্তভাবেই চৈনিক তথা মা-হুয়ানের বিবরণের ওপর ভরসা করতে হয়।

সুলতান সাইফউদ্দিন হামজা শাহ

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সাইফউদ্দিন হামজা শাহ সুলতান হন। এ পর্যন্ত তাঁর শাসনকালের কোন লিপি প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে মুদ্রার সাক্ষ্যে বলা যায় যে, তিনি ৮১৩ হিজরি (১৪১০-১১ খ্রিঃ) হতে ৮১৪ হিজরি (১৪১১-১২ খ্রিঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মুদ্রায় তিনি 'সুলতান-উস-সালাতীন' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেও চীন দেশের সাথে সদ্ভাব অক্ষুন্ন ছিল এবং দূত বিনিময় হয়েছিল । রাজা গণেশের চক্রান্তে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিন তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ

মুদ্রায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিহাবউদ্দিন সুলতান হয়ে শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ নামে ৮১৪ হিজরি (১৪১১-১২ খ্রিঃ) হতে সুলতান সাইফউদ্দিন হামজা শাহের ক্রীতদাস ছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বীয় প্রভুকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। শিহাবউদ্দিনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত, রাজা গণেশের চক্রান্তে তাঁকে হত্যা করা হয়।

সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

মুদ্রা প্রমাণে বলা যায়, শিহাবউদ্দিন ফিরোজ শাহ সুলতান হন। সাতগাঁও ও মুয়াজ্জামাবাদ টাকশাল হতে উৎকীর্ণ তাঁর ৭১৭ হিজরির (১৪১৪-১৫ খ্রিঃ) মুদ্রা পাওয়া গেছে। এমনও হতে পারে যে, গনেশের চক্রান্তে পিতার মৃত্যু হলে আলাউদ্দিন রাজধানী ফিরোজাবাদ ত্যাগ করে রাজ্যের কিছু অংশে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করতে সমর্থ হন। তবে তাঁর রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। রাজা গণেশ তাঁকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলো।

এভাবে সাময়িকভাবে বাংলার রাজধানীতে রাজা গণেশের আবির্ভাবই ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন অবসানের প্রধান কারণ। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের হত্যা হতে শুরু করে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের হত্যা ও অপসারণ পর্যন্ত রাজা গণেশের প্রভাবই বাংলার রাজনীতির ধারা নির্ধারণ করেছিল।

রাজা গণেশ

৮১৭ হিজরি (১৪১৪-১৫ খ্রিঃ) সালের পর বাংলার ইতিহাসে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ শাসন বজায় রেখেছিলেন।রাজা গণেশের ইতিহাস পুনরুদ্ধার কষ্টসাধ্য।কারণ সমসাময়িককালের কোন ইতিহাস নেই বললেই চলে। কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জিতে রাজা গণেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে গণেশ ও তাঁর বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যে সমস্ত সূত্রের মধ্যে গণেশ ও তাঁর বংশের ইতিহাস পাওয়া যায় তার মধ্যে আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী, নিজামউদ্দিন বখ্শী রচিত তাবাকাৎ-ই-আকবরী ও গোলাম হোসেন সলিম রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন উল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্তী সময়ে লিখিত এসব সূত্রে ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে কতখানি সত্যতা নিহিত আছে বলা কঠিন। মুদ্রার মত প্রামাণিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মোটামুটিভাবে রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা যায়।

বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের পূর্বে গণেশের পরিচয় সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে, গণেশ ছিলেন ভাতুড়িয়ার জমিদার। গণেশ যে একজন জমিদার ছিলেন তা শেখ নূর কুতুব-ই-আলমের একখানি চিঠি হতেও জানা যায়। ফিরিশতার বিবরণ হতে জানা যায় যে, শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্বে গণেশ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের অমাত্য ছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যু প্রসঙ্গে আমরা গণেশের প্রথম উল্লেখ পাই এবং পরবর্তী সুলতানদের সময় তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন অমাত্য হিসেবে দেখতে পাই। এই সময় গণেশের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিণতি হয়েছিল বাংলার সিংহাসন অধিকার। আজম শাহের পরবর্তী তিনজন সুলতানের শাসনকালে গণেশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং তাঁরই ষড়যন্ত্রে শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহের মৃত্যু হয় এবং আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ অপসারিত ও নিহত হন। রাজা গণেশ বাংলার সর্বময় ক্ষমতা অধিকার করতে সক্ষম হন।

রিয়াজ-উস-সালাতীন হতে জানা যায়, ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন উচ্ছেদ করে রাজা গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সাথে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। গণেশ অনেক মুসলমান দরবেশকে হত্যা করেন। দরবেশদের নেতা নূর কুতুব-ই-আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলা আক্রমণের আহ্বান জানান। সুলতান ইব্রাহিম সসৈন্য বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গণেশ নতি স্বীকার করেন এবং নূর কুতুব-ই-আলমের সাথে আপোষ করেন। আপোষের শর্তানুযায়ী রাজা গণেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং যদুই জালালউদ্দিন মাহমুদ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী জালালউদ্দিনকে সিংহাসনে বসিয়ে জৌনপুরে ফিরে যান। বুকাননের বিবরণীতেও এ ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। মুদ্রা প্রমাণেও এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, ৮১৮ হিজরি হতে সুলতান জালালউদ্দিন মাহমুদ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮১৭ হিজরিতে জারিকৃত সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের মুদ্রা পাওয়া গেছে। সুতরাং রাজা গণেশ অতি অল্পকালের জন্য (৮১৭ হিজরির শেষের দিকে বা ৮১৮ হিজরির প্রথম দিকে) সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ৮১৮ হিজরি হতে তাঁর পুত্র যদু জালালউদ্দিন নামে বাংলা শাসন করতে থাকেন।

কোন কোন সূত্রে রাজা গণেশ কর্তৃক দ্বিতীয় বার সিংহাসন অধিকারের উল্লেখ আছে। সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর প্রত্যাবর্তনের পরপরই রাজা গণেশ শাসনদন্ড পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং পুত্র যদুকে সুবর্ণধেনু ব্রত দ্বারা পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে পান্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম টাকশাল হতে প্রকাশিত দনুজমর্দন দেব নামে একজন হিন্দুরাজার কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। ১৩৪০ শকাব্দে পান্ডুনগর ও চাটিগ্রাম টাকশাল হতে প্রকাশিত মহেন্দ্রদেব নামে একজন রাজার মুদ্রাও পাওয়া গেছে। মুদ্রা প্রমাণের

ওপর ভিত্তি করে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মত প্রকাশ করেন যে, এ সময় রাজা গণেশ গৌরবসূচক "দুনজমর্দন" ও "চন্ডীচরণ পরায়ণ" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভট্টশালীর এই মত সর্বজনস্বীকৃত নয়। অনেকে দনুজমর্দন দেবকে পূর্ববঙ্গীয় রাজা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

সুলতান জালালউদ্দিন মাহ্মুদ শাহ

৮২১ হিজরি হতে আবার জালালউদ্দিন মাহমুদের মুদ্রা পাওয়া যায়। যদি রাজা গণেশ কর্তৃক দ্বিতীয় বার সিংহাসন অধিকারের কথা সত্য হয়ে থাকে তবে মনে করতে হবে যে, রাজা গণেশ ৮১৯-২০ হিজরিতে ক্ষমতাসীন ছিলেন। মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে, জালালউদ্দিন মাহমুদ ৮২১ হিজরি হতে ৮৩৫ হিজরি পর্যন্ত (১৪১৮-১৪৩১ খ্রিঃ) রাজত্ব করেছিলেন।অনেকে দনুজমর্দন দেবের উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র দেব ও জালালউদ্দিনকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ মহেন্দ্র দেবকে গণেশের দ্বিতীয় পুত্র বলে মত প্রকাশ করেছেন। সীমিত তথ্যের ওপর নির্ভর করে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যে, দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি এবং তাঁরা জালালউদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলাদেশের কিছু অংশে ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শাসক হিসেবে জালালউদ্দিন মাহমুদ সুনাম অর্জন করেছিলেন। ফিরিশতা, নিজামউদ্দিন বখ্শী ও গোলাম হোসেন সলিম তাঁর সুশাসনের প্রশংসা করেছেন। ফিরোজাবাদ, সোনারগাঁও, মুয়াজ্জামাবাদ, সাতগাঁও, চাটগাঁও, ফতেহাবাদ ও রোতাসপুর টাকশাল হতে তাঁর মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে মনে হয় উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, ও দক্ষিণ বঙ্গের বৃহদাংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রিয়াজ-উস-সালাতীন হতে জানা যায় যে, তিনি রাজধানী পান্ডুয়া হতে গৌড়ে স্থানান্তর করেন। একই সূত্রে জানা যায় যে, জালালউদ্দিন মাহমুদ স্ত্রী ও পুত্রসহ পান্ডুয়ায় একলাখী সমাধি সৌধে সমাহিত আছেন। এই সমাধি সৌধ বাংলার মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্যসাধারণ নিদর্শন।

জালালউদ্দিন মাহমুদ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে মুদ্রায় 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি চীনা সম্রাট, মিশর ও পারস্যের সুলতান এবং দামেস্কের খলিফার সাথে দূত বিনিময় করেছিলেন।

সুলতান জালালউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৮৩৬ হিজরিতে উৎকীর্ণ তাঁর একটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। শামসউদ্দিন আহম্মদ শাহ সম্বন্ধে ফিরিশতা ও রিয়াজ-উস-সালাতীনে পরস্পর বিরোধী তথ্য আছে। ফিরিশতা তাঁকে ন্যায়পরায়ণ ও উদার বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সলিম তাঁকে অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু বলে আখ্যা দিয়েছেন।সভাসদগণের ষড়যন্ত্রে সুলতানের দুজন ক্রীতদাস সাদী খান ও নাসির খান সুলতানকে হত্যা করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

পরবর্তীকালে সাদী খানকে হত্যা করে নাসির খান নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ক্রীতদাসের আধিপত্য অপমানজনক বিবেচনা করে গৌড়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সাত দিনের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করে। অমাত্য ও সেনানায়কগণ ইলিয়াস শাহের এক বংশধর নাসির খানকে সিংহাসনে বসান। এভাবে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরাভ্যুদয় হয়।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী যুগ

ইলিয়াস শাহের পরবর্তী এক বংশধর নাসির খান ৮৪৬ হিজরিতে (১৪৪২ খ্রিঃ) সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ উপাধি ধারণ করে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ৮৯০ হিজরি পর্যন্ত ৪৫ বৎসর কাল পুন:প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন বাংলায় কায়েম ছিল।

সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ

সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সাথে রাজ্যশাসন করেছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনে উল্লেখিত আছে যে, তাঁর শাসনকালে বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সমস্ত প্রজা তৃপ্ত ছিল। বাংলার মুসলিম রাজ্যে পুনরায় সামরিক শক্তি সঞ্চার হয়েছিল বলে মনে হয়। বাগেরহাটের খান জাহানের সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হতে জানা যায় যে, যশোর ও খুলনা অঞ্চল নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।এ অঞ্চলে ব্যাপক প্রবাদ আছে যে, খান জাহান নামে বাংলার সুলতানের একজন সেনাপতি ঐ অঞ্চলে প্রথম মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যা রাজ কপিলেন্দ্র দেবের এক শিলালিপি হতে জানা যায় যে, তাঁর সাথে গৌড়েশ্বর-এর যুদ্ধ হয়েছিল। সম্ভবত কপিলেন্দ্র দেবের সমসাময়িক গৌড়ের সুলতান ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। মিথিলা রাজ্যের সাথে নাসিরউদ্দিনের যুদ্ধ হয়েছিল বলেও অনুমান করা হয়।

নাসিরউদ্দিন মাহমুদের রাজত্বকালের টাকশাল ও বিভিন্ন শিলালিপির অবস্থান হতে তাঁর রাজ্যসীমা অনুমান করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, তাঁর রাজ্যসীমা পশ্চিমে ভাগলপুর, পূর্বে ফরিদপুর, উত্তরে গৌড় পান্ডুয়া এবং দক্ষিণে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তাঁর রাজত্বকালে বহু মসজিদ, খানকাহ্, তোরণ, সেতু, সমাধিসৌধ ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল বলে লিপি প্রমাণ আছে। সুতরাং মনে হয় তাঁর রাজত্বে দেশে শান্তি বিরাজমান ছিল। সুলতান নাসিরউদ্দিন স্থাপত্য শিল্পে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন। ৮৬৩ হিজরি পর্যন্ত তাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব সম্ভবত ঐ বৎসরই তাঁর মৃত্যু হয়।

সুলতান বরবক শাহ

নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনউদ্দিন বরবক শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৮৬৩ হতে ৮৭৮ হিজরি পর্যন্ত তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে পিতার রাজত্বকালে তিনি সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা হিসেবে কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। সুলতান হিসেবেও তিনি অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

বরবক শাহের সামরিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের ইতিহাস আমরা বিখ্যাত সৈনিক দরবেশ শাহ ইসমাইল গাজির জীবনী "রিসালাত-উস-কোহাদা' হতে জানতে পারি। পীর মুহাম্মদ শাত্তারী ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে এটি রচনা করেন। বরবক শাহ তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে উড়িষ্যারাজ গজপতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। শাহ ইসমাইল গাজির নেতৃত্বে এই বাহিনী গজপতিকে পরাজিত করে গড়মন্দারণ উদ্ধার করেন। এর কিছুকাল পর শাহ ইসমাইল কামরূপরাজ কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সন্তোষের রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধে বাংলার সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটে। সামরিক বিজয়ে ব্যর্থ হলেও শাহ ইসমাইল গাজি তাঁর সাধুগুণের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল করেন। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে কামরূপরাজ আত্মসমর্পন করেন ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীতে ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ভান্ডসী রাওয়ের কুপ্ররোচনায় বরবক শাহের আদেশে (১৪৭৪ খ্রিঃ) ইসমাইলকে হত্যা করা হয়।

বরবক শাহের রাজত্বকালে হাবশী দাসগণ শাসনকার্যে প্রাধান্য লাভ করে। কথিত আছে, তিনি প্রায় আট হাজার ক্রীতদাস সংগ্রহ করে রাজ্যের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করেছিলেন। হাবশীদের এই প্রাধান্য বিস্তারের ফলেই পরবর্তীকালে তারা সিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বরবক শাহ নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং পন্ডিত ব্যক্তিদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থ রচনা করেন। বরবক শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেছিলেন। মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজও 'খান' উপাধি পেয়েছিলেন। স্থাপত্য শিল্পক্ষেত্রেও বরবক শাহের অবদান রয়েছে। গৌড়ে রাজপ্রাসাদ এবং 'দাখিল দরওয়াজা' নামে পরিচিত বিরাট প্রবেশ- তোরণটি তাঁর স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

সুলতান শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ

বরবক শাহের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ধর্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুদক্ষ নরপতি বলে প্রশংসা করেছেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল বলে মনে হয়। তাঁর আদেশে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে গৌড়ের কদমরসুল মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ ও তাঁতীপাড়া মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কানিংহামের মতে গৌড়ের লোটন মসজিদও তাঁরই কীর্তি। তাঁর আমলের শিলালিপিসমূহের প্রাপ্তিস্থান হতে মনে হয় যে, তিনি বিশাল সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুদ্রা ও শিলালিপি প্রমাণে বলা যায় যে, তিনি ৮৮৫ হিজরি পর্যন্ত (১৪৮০-৮১ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন।

ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য অল্পদিন পরেই তাঁকে অপসারিত করে ইউসুফ শাহের অন্য পুত্র জালালউদ্দিন ফতেহ শাহকে সিংহাসনে বসানো হয়। লিপি ও মুদ্রা প্রমাণে বলা যায় যে, তিনি ৮৮৬ হতে ৮৯২ হিজরি (১৪৮১-৮৬ খ্রিঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রুকনউদ্দিন বরবক শাহ ও ইউসুফ শাহের শাসনকালে হাবশী ক্রীতদাসদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। অত্যাধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তারা অকস্মাৎ উদ্ধত হয়ে ওঠে। ফতেহ শাহ তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে মনস্থ করেন এবং উদ্ধত দাসদের প্রাণদন্ডের আদেশ দেন। ফলে বিরোধীদল ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফতেহ শাহকে হত্যা করে প্রাসাদরক্ষী সুলতান শাহজাদা "বরবক শাহ" উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভাবে বাংলার মুসলিম রাজ্যে ইলিয়াস শাহী বংশের গৌরবময় শাসনের অবসান ঘটে। এবং হাবশী ক্রীতদাসদের শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

প্রায় ছয় বৎসর কাল (৮৯০-৮৯৬ হিঃ; ১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিঃ) বাংলায় হাবশী শাসন কায়েম ছিল। বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এই ছয় বৎসর এক কালো অধ্যায়। এই ছয় বৎসরে চারজন হাবশী বরবক শাহ, মালিক আন্দিল, দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ও শামসউদ্দিন মুজাফফর শাহ সিংহাসন অধিকার করেন এবং প্রত্যেক সুলতানই নিহত হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, হত্যা ও নাতিদীর্ঘ রাজত্ব বাংলাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

ইলিয়াস শাহী যুগের কৃতিত্ব

বাংলার ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী যুগ একটি স্মরণীয় যুগ। এই বংশ বাংলায় প্রায় ১২০ বৎসর কাল শাসনকার্য পরিচালনা করে। ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ যদিও প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহই সমগ্র বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে স্বাধীন সুলতানি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের বাংলা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা দুই দুইবার ব্যাহত করে ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী করতে তাঁদের এই সাফল্য নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল।

দিল্লির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ফলে বাংলাদেশের ইলিয়াস শাহী শাসকগণ স্বাভাবিক কারণেই দেশীয় জানগণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে মুসলিম শাসন বাংলীয় মুসলিম শাসনে পরিণত হয়। উচ্চ রাজপদে হিন্দুদের নিয়োগ, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর এবং দেশীয় পন্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা ইলিয়াস শাহী শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশে মুসলিম সামরিক বিজয়কে সাংস্কৃতিক বিজয় দ্বারা সুসম্পন্নকরণে ইলিয়াস শাহী বংশের বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে।

স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও ইলিয়াস শাহী বংশের বিশেষ অবদান রয়েছে। এই যুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হয়ে এক নতুন রূপ ধারণ করেছিল। বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও সমাধিসৌধ এই যুগে নির্মিত হয়েছে।

ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বলিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মসজিদ মাদ্রাসা, ও খানকাহ্ স্থাপনের সাথে সাথে তাঁরা প্রায় সকলেই সুফি ও আলেমদের বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। ফলে ইসলাম ধর্মও ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

বাংলার মুসলিম রাজ্যকে বহির্বিশ্বের সাথে পরিচিত করার কৃতিত্বও ইলিয়াস শাহী সুলতানদের। আরবদেশ ও পারস্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং দীর্ঘকালব্যাপী চীনের সাথে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলাকে বর্হিবিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন।

সুতরাং বলা যায় যে, স্বাধীনতা দৃঢ় করে সমগ্র বাংলাব্যাপী মুসলিম রাজ্য অক্ষুন্ন রেখে, স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করে, স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে, শিল্পকলা বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে ইলিয়াস শাহী শাসকগণ বাংলার মুসলিম রাজ্যকে এক নতুন রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সারসংক্ষেপ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ শাসন অব্যাহত রাখেন। সুলতান সিকান্দার শাহ ৩৫ বছর যাবত অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে রাজ্য শাসন করেন। এরপর গিয়াসউদ্দিন আযন শাহ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এর কিছুকাল পর বাংলার রাজনীতিতে রাজা গণেশের আবির্ভাব ঘটে। বলা হয়ে থাকে আযম শাহের হত্যা হতে শুরু করে ফিরোজ শাহের হত্যা ও অপসারণ গণেশের প্রভাবেই ঘটে। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী যুগে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ, বরকত শাহ, শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ প্রমুখ রাজত্ব করেন। রাজত্বের শেষ দিকে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, হত্যা ও নাতিদীর্ঘ রাজত্ব ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলার ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী যুগ স্মরণীয়। রাজনৈতিক কৃতিত্বের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিজয় এই যুগকে মহিমান্বিত করেছে। বাংলার মুসলিম রাজ্যকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করার কৃতিত্ব একান্তই ইলিয়াস শাহী সুলতানদের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন–

(ক) ইলিয়াস শাহ (খ) শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ

(গ) সিকান্দার শাহ (ঘ) গিয়াসুদ্দিন আযম শাহ।

২। গিয়াসুদ্দিন আযম শাহ কার উত্তরাধিকারী ছিলেন?

(ক) ইলিয়াস শাহ (খ) সিকান্দার শাহ

(গ) শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ (ঘ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

৩। মা-হুয়ানের বিবরণ হতে জানা যায়–

(ক) রাজনৈতিক চিত্র (খ) ধর্মীয় চিত্র

(গ) বৈদেশিক সম্পর্ক (ঘ) আর্থ-সামাজিক চিত্র।

৪। জালালউদ্দিনের পিতার নাম –

(ক) গণেশ (খ) আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

(গ) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ (ঘ) শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

৫। সুলতান বরকত শাহ কোন বংশের সুলতান?

(ক) ইলিয়াস শাহী (খ) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী

(গ) মোবারক শাহী (ঘ) হুসেন শাহী।

৬। ইলিয়াস শাহী যুগের স্থায়িত্ব–

(ক) ২১০ বৎসর (খ) ১২০ বৎসর

(গ) ১৩০ বৎসর (ঘ) ৩১০ বৎসর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। মা-হুয়ানের বিবরণের ভিত্তিতে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনচিত্র অঙ্কন করুন।

২। রাজা গণেশ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। সুলতান জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় স্বাধীন সুলতানির দৃঢ় প্রতিষ্ঠায় সিকান্দার শাহের কৃতিত্ব নিরূপণ করুন।

২। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

৩। রাজা গণেশ কে? তাঁর শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিন।

৪। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করুন।

৫। বাংলার ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী যুগের অবদান মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানিআমল।*

২। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

২। Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal,* Vol-II.

পাঠ - ৫

বাংলায় হুসেন শাহী শাসন ঃ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- হুসেন শাহী যুগের রাজনৈতিক অবস্থা জানতে পারবেন ;
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের জীবন ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- হুসেন শাহের সামরিক কৃতিত্ব এবং রাজ্যসীমা সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- হুসেন শাহের ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানবেন ;
- নসরৎ শাহ ও ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বাংলায় হাবশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে উজির সৈয়দ হুসেন 'সুলতান আলউদ্দিন হুসেন শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আর এরই মাধ্যমে হাবশী শাসনের দুর্যোগময় অধ্যায়ের অবসান ঘটে। সূচিত হয় শান্তি ও শৃংক্মখলার যুগ। হাবশী শাসনের ধারাবাহিকতায় ছিল সিংহাসন নিয়ে বিবাদ, ষড়যন্ত্র, হত্যা ও প্রজাসাধারণের ওপর নির্মম অত্যাচার। বাংলার মুসলিম রাজ্যে এ ধরনের শোচনীয় অবস্থায় প্রয়োজন ছিল একজন যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তির। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন এবং শান্তি-শৃংক্মখলা পুন:প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাংলার মুসলিম শাসনকে এক নবজীবন দান করেন। ১৪৯৩ হতে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের চারজন সুলতান বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁরা ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। তাঁদের শাসনকালে দেশে শান্তি-শৃংক্মখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামরিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও বাঙালি প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পেয়েছিল বিশিষ্ট রূপ। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ফলে বাঙালি জীবনে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। আর এ সময়ই প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল বৈষ্ণব ধর্মের। এক কথায় বলা যায়, এ সময় বাংলার সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই হুসেন শাহী যুগকে বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জল যুগ বলা যেতে পারে।

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

বাংলার মুসলিম সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। তাঁর খ্যাতি এ দেশের ঘরে ঘরে জনস্মৃতিতে আজও অম্লান। উড়িষ্যা হতে ব্রক্ষপুত্র অববাহিকাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগে তাঁর নাম সুপরিচিত। সুশাসনই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক। ফলে চৈতন্যের সাথে তাঁর নামও বাঙালি স্মৃতিতে পেয়েছে স্থায়ী আসন।

বাংলার অন্যান্য সুলতানদের মত আলাউদ্দিন হুসেন শাহের প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁর শাসনকালের বেশ কিছু সংখ্যক লিপি পাওয়া গেছে। তবে সমসাময়িক লেখনিতে তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। আরবি, ফার্সি, বাংলা, সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমিয়া, পর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষায় লেখা বিভিন্ন সূত্রে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সম্বন্ধে খন্ড খন্ড তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের লেখা ফার্সি ইতিহাসেও কিছু কিছু তথ্য আছে, তবে এগুলোর মধ্যে একমাত্র রিয়াজ-উস-সালাতীনে রয়েছে কিছুটা বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বিবরণ। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে চৈতন্য জীবনী গ্রন্থসমূহে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তথ্য। তাছাড়া উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জি, আসামের বুরঞ্জী এবং ত্রিপুরার

রাজমালায় ঐসব দেশের সাথে হুসেন শাহের যুদ্ধের কিছু বিবরণ রয়েছে। তবে এর কোনটিই সমসাময়িক নয় এবং এদের বর্ণনায় পক্ষপাত সুস্পষ্ট। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালেই পর্তুগিজরা প্রথম বাংলায় পদার্পন করেন। ফলে কয়েকজন পর্তুগিজ পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং জোয়া দ্য ব্যারোস প্রমুখ পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের লেখনিতেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে এসব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হতেই আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা যায়। তবে তা কষ্টসাধ্য এবং স্থানে স্থানে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের বাল্যজীবন ও ক্ষমতা লাভ সম্বন্ধে তেমন স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। বিভিন্ন সূত্রে যে সব তথ্য আছে তার ওপর ভিত্তি করে আধুনিক পন্ডিতগণ বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করেছেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনের লেখক সলিমের মতে হুসেন শাহ তাঁর পিতা সৈয়দ আশরাফুল হোসেন ও ভ্রাতা ইউসুফের সাথে সুদূর তুর্কিস্থানের তিরমিজ শহর থেকে আসেন এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার কাজি তাঁদের দুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাঁদের উচ্চবংশ মর্যাদার কথা শুনে হুসেনের সাথেতার নিজ কন্যার বিয়ে দেন। হুসেন বাংলার রাজধানী গৌড়ে যান এবং মুজাফ্ফর শাহের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। নিজ যোগ্যতায় তিনি পরবর্তীকালে উজির পদে উন্নীত হন। সলিম ও ফিরিস্তা তাঁদের লেখায় হুসেনকে 'সৈয়দ' বলে উল্লেখ করেন এবং মনে করা হয় যে, তাঁরা আরবের অধিবাসী ছিলেন। লিপি ও মুদ্রায় হুসেনের আরব ও সৈয়দ বংশের সাথে সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। বাল্যজীবনে চাঁদপাড়ার সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ জেলার বহুল প্রচলিত কিংবদন্তীতে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার 'একানি চাঁদপাড়া' (বা চাঁনপাড়া) গ্রামের আশেপাশে হুসেন শাহের রাজত্বকালের বেশ কয়েকটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হুসেন বাল্যকালে চাঁদপাড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখালের কাজ করতেন এবং পরবর্তীকালে সুলতান হয়ে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা করের বিনিময়ে চাঁদপাড়া গ্রামখানি ভোগ করার অধিকার দিয়েছিলেন। এখনও এই গ্রামের নাম একানি চাঁদপাড়া– যা এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে।

চাঁদপাড়া হতে হুসেন গৌড়ে যান এবং সেখানে চাকুরি গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অন্য এক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার অনেক আগে সৈয়দ হুসেন 'গৌড় অধিকারী' (উচ্চ রাজকর্মচারী) সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরি করতেন। সুবুদ্ধি তাঁকে একটি দীঘি খননের কাজে নিয়োগ করেন এবং কাজে ত্রুটির জন্য তাঁকে বেত্রাঘাত করেন। পরে সৈয়দ হুসেন সুলতান হয়ে সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু স্ত্রীর প্ররোচণায় তিনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন। এই কাহিনীর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। তবে গৌড়ে সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরি গ্রহণ মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ধারণা করা হয় যে, সামান্য চাকুরি হতে হুসেন নিজ যোগ্যতা বলে উচ্চ রাজপদে উন্নীত হন এবং খুব সম্ভবত হাবশী সুলতান মুজাফ্ফর শাহের রাজত্বকালে তিনি উজির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোলাম হোসেন সলিম ও নিজামউদ্দিন আহমেদ বখ্শী তাঁকে উজির বলেই উল্লেখ করেছেন। মুজাফ্ফর শাহের হত্যার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তবে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। খুব সম্ভবত মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের অমাত্যগণ মিলিত হয়ে হুসেন শাহকে সুলতান মনোনীত করেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের সীমা চারিদিকে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। তবে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করার পূর্বে হুসেন শাহ অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এছাড়া অরাজকতা সৃষ্টিকারী সৈন্য দলকেও তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সুলতানের হত্যাকান্ডে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল দেহরক্ষী পাইকদল। তাই হুসেন শাহ পাইকদের দল ভেঙ্গে দিয়ে নতুন এক রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। সে সাথে হাবশীদেরও তিনি রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন এবং তাদের পরিবর্তে সৈয়দ, মোঙ্গল, আফগান ও হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। এছাড়া রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিধানের উদ্দেশ্যে তিনি নিয়োগ করেন অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী।

অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুন:স্থাপন করে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ রাজ্য সীমা সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করেন। এক্ষেত্রে সিকান্দার লোদির সাথে সন্ধি ও উত্তর বিহার অধিকার ছিল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। সিংহাসন আরোহণের দুই বৎসরের মধ্যেই হুসেন শাহ দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদির সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদি ও জৌনপুরের শর্কী শাসক হোসেন শাহ শর্কীর সংঘর্ষ চরমে পৌঁছে এবং দিল্লির সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে বেনারসের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। হোসেন শাহ শর্কী পরাজিত হয়ে বাংলা অভিমুখে পলায়ন করেন। বংলার সুলতান হুসেন শাহ শর্কী সুলতানকে উপযুক্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান। তিনি তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন এবং ভাগলপুরের কাছে কহলগাঁও-এ থাকার ব্যবস্থা করেন। হুসেন শাহ সম্ভবত মনে করেছিলেন যে, জৌনপুর রাজ্য দিল্লি ও বাংলার মধ্যে ব্যবধান হিসেবে থাকলে তাঁর পক্ষে মঙ্গলকর হবে। জৌনপুরের শাসকদের প্রতি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের এই মিত্রতাসূলভ আচরণে সিকান্দর লোদি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এক্ষেত্রে তিনি ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ খান লোদি এবং মুবারক খান লোহানীর নেতৃত্বে হুসেন শাহের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। হুসেন শাহও এই আক্রমণ বাধা দেবার জন্য তাঁর পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পাঠান।

বিহারের বারহ নামক স্থানে (পাটনার পূর্বাঞ্চল) দুই পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হন। কিন্তু কোন যুদ্ধ ছাড়াই শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপন করে উভয় পক্ষ স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে যান। সন্ধির সময় হুসেন শাহের পক্ষে দানিয়েল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সিকান্দর শাহের শত্রুকে ভবিষ্যতে আর বাংলায় আশ্রয় দেয়া হবে না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে বোঝা যায়, এই শর্ত পালিত হয়নি। সারণ ও মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত হুসেন শাহের শিলালিপি থেকে জানা যায়, হুসেন শাহ সমগ্র উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। সম্ভবত সিকান্দর লোদির সাথে সন্ধির শর্তানুসারে অথবা সিকান্দর লোদির সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পর যুদ্ধ করে তিনি এই এলাকাসমূহ দখল করেন। তবে এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

পশ্চিম সীমান্তের ভয় দূরীভূত হলে হুসেন শাহ পূর্ব সীমান্তে রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। হুসেন শাহ তাঁর রাজত্বের প্রথম বৎসর হতেই মুদ্রায় নিজেকে কামরূপ, কামতা, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুদ্রায় এই উল্লেখ একথা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে হুসেন শাহ প্রথম থেকেই রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই উল্লেখযুক্ত মুদ্রাই তাঁর রাজত্বকালে বিভিন্ন সময় জারি করা হয়েছে। ৯২৪ হিজরি/ ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রায় এরই উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'বাহারিস্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে কামরূপ ও কামতা রাজ্যদ্বয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। কামরূপ রাজ্যের পূর্বসীমা ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমসীমা ছিল বনসা বা মনসা নদী। কামতা রাজ্য বনসা হতে শুরু হয়ে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খেন বংশীয় তৃতীয় রাজা নীলাম্বর সামরিক বিজয় দ্বারা রাজ্য দুটি একত্রিত করেছিলেন। পূর্বে বরনদী হতে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত এক বিশাল ভূ-খন্ডের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। হাবশী শাসনকালে খেনরাজগণ করতোয়ার পূর্ব তীরস্থ অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এমনকি বাংলার মুসলিম রাজ্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী ঘোড়াঘাট ও কান্তাদুয়ারও তাঁদের অধিকারে ছিল। সুতরাং পূর্ব সীমান্তের এই শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

বাংলার মুসলিম রাজ্যের সাথে কামরূপের সংঘর্ষ কোন নতুন ঘটনা নয়। মুসলিম রাজ্যের প্রাথমিক যুগ থেকেই এই সংঘর্ষ চলে আসছিল। প্রচলিত কিংবদন্তীতে হুসেন শাহ এই বিজয়ে নীলাম্বরের মন্ত্রী কর্তৃক প্ররোচিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। এই সংঘর্ষে হুসেনের সাফল্য সম্বন্ধে প্রায় সব সূত্রই একমত। তবে কোন কোন সূত্রে উল্লেখ আছে যে, মুসলমানদের জয় হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকাতর মাধ্যমে। মনে হয় দীর্ঘকাল অবরোধের পর হুসেন শাহ জয় লাভ করেন এবং কামতা–কামরূপ বাংলার মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দানিয়েলের ওপর অর্পণ করা হয় বিজিত রাজ্যের শাসনভার। অসমীয়া বুরঞ্জীতে তাঁকে দুলাল গাজি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খুব সম্ভবত দানিয়েলের বিকৃত রূপই দুলাল গাজি। হুসেন শাহের রাজত্বকালে কামরূপে মুসলমান অধিকার বজায় ছিল। কারণ আসমীয়া বুরঞ্জীর মতে পরবর্তী সুলতান নসরৎ

শাহের রাজত্বকালে কামরূপ রাজ্য বাংলার সুলতানের অধিকারে ছিল এবং সেখান থেকে আসামে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল।

মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের 'আলমগীর নামা', শিহাবউদ্দিন তালিশের 'তারিখ-ফত-ই আসাম' (অথবা ফত্হিয়া-ই-ইব্রিয়া) ও গোলাম হোসেন সলিমের রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে হুসেন শাহ কর্তৃক আসাম অভিযানের উল্লেখ আছে। অসমীয়া বুরঞ্জীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে, হুসেন শাহ কামরূপ বিজয়ের পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এই বাহিনীর সাথে প্রেরণ করা হয়েছিল এক বিশাল অশ্বারোহী, পদাতিক সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনী। আসামের রাজা তাঁকে বাধা না দিয়ে সমতল অঞ্চল ত্যাগ করে পার্বত্য অঞ্চলে চলে যান। হুসেন শাহ সমতল অঞ্চলে পুত্র দানিয়েলকে (দুলাল গাজি) রেখে ফিরে আসেন। কিন্তু বর্ষার আগমনের সাথে সাথেই আসাম রাজ্য পাল্টা আক্রমণ করে। বর্ষাকালে সমগ্র অঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় মুসলমান সৈন্যদল বিপদের সম্মুখীন হলে আসামরাজ এই সৈন্যদলকে পরাজিত করেন এবং স্বরাজ্য হতে বিতাড়িত করেন। মোটামুটিভাবে বিভিন্ন সূত্রের ভিত্তিতে এটাই মনে হয় যে, প্রাথমিক সাফল্যের পর হুসেন শাহের আসাম অভিযান শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। আসামের হুসেনশাহী পরগণা নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও হুসেন শাহের স্মৃতি বহন করছে।

কামরূপ ও আসামের বিরুদ্ধে অভিযানের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। ৮৯৯ হি:/১৪৯৪ খ্রি: হতে ৯২৪ হি:/১৫১৮ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সময় উৎকীর্ণ মুদ্রায় কামরূপ-কামতা ও উড়িষ্যা–জাজনগর জয়ের উল্লেখ আছে। তাই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ১৪৯৪ খ্রি: হতে আসাম অভিযান শুরু হয় এবং খুব সম্ভবত ১৪৯৮ খ্রি: পর্যন্ত এই অভিযান চলে।

মুদ্রার উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, উড়িষ্যার সাথেও হুসেন শাহের সংঘর্ষ হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ ভ্রমণকারী বারবোসা এই সংঘর্ষের কথা উল্লেখকরেছেন। রিয়াজ ও বুকাননের পান্ডুলিপিতে এবং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বৃন্দাবন দাসের লেখনিতে, এই সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মাদলা পঞ্জিকায় ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা গৌড়ের মুসলিম সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন শক্তিশালী রাজা। তাঁর রাজত্বকালের ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের এক লিপিতে মুসলিমরাজ কর্তৃক হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধারের উল্লেখ হুসেন শাহের আক্রমণের কথাই প্রমাণ করে। তবে হুসেন শাহের সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে ক্ষণস্থায়ী সাফল্য যে হয়েছিল সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই।

হুসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেকদিন ধরে চলেছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস 'রাজমালায়' এই সংঘর্ষের উল্লেখ রয়েছে। কখন হতে প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার সাথে হুসেন শাহের যুদ্ধ শুরু হয় সে বিষয়ে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে সোনারগাঁও–এ প্রাপ্ত হুসেন শাহের এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই তিনি ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করেছিলেন। এই লিপিতে হুসেন শাহের কর্মচারী খওয়াস খানকে ত্রিপুরার 'সর-ই লস্কর' (সামরিক প্রশাসক) বলা হয়েছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে হুসেন শাহ কর্তৃক ত্রিপুরা জয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীকর নন্দীও লিখেছেন যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষক হুসেন শাহের অন্যতম সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। রাজমালায় হুসেন শাহ এবং ত্রিপুরারাজ ধান্য মানিক্যের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌড় মল্লিক ও হাতিয়ান খানের অধীনে প্রেরিত অভিযান ত্রিপুরা বাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়। তবে পরবর্তীকালের অভিযান যে সাফল্য লাভ করেছিল তা লিপি প্রমাণ হতে নি:সন্দেহে বলা যায়।

এমনও হতে পারে যে, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সাফল্য চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজের মধ্যে সংঘর্ষের সাথে জড়িত ছিল। রাজমালা হতে জানা যায় যে, ধান্য মানিক্য কিছুকালের জন্য চট্টগ্রামের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।এতে আরাকানরাজ কর্তৃক স্বল্প সময়ের জন্য চট্টগ্রাম দখলেরও উল্লেখ আছে। তবে চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে হুসেন শাহের অধিকারেরও বহু প্রমাণ রয়েছে সমসমায়িক বাংলা সাহিত্য ও অন্যান্য সূত্রে। আর তাই মনে হয় যে, চট্টগ্রাম অধিকারকে কেন্দ্র করে হুসেন শাহের সাথে ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। চট্টগ্রামের অবস্থিতি এবং বাণিজ্যিক কারণে এই সংঘর্ষ ছিল খুবই স্বাভাবিক। তবে নি:সন্দেহে বলা যায় যে, আরাকান ও ত্রিপুরা রাজাদের চট্টগ্রামের ওপর অধিকার

খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং ১৫১৭ হতে ১৫৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে চট্টগ্রামের ওপর হুসেন শাহী শাসকদের অধিকার ছিল অক্ষুন্ন। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ এবং খুব সম্ভবত পরবর্তীকালে পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খান আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেন। পরাগল খান ও ছুটি খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। পর্তুগিজ দূত জাও-দা সিলভেরিওর উক্তি অনুসারে মনে হয় যে, ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন। জোয়া দ্য ব্যারোস উল্লেখ করেছেন যে, আরাকানরাজ গৌড়রাজের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন।

হুসেন শাহ তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে সামরিকক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি কামতাপুরের খেন রাজ্য ধ্বংস করেন। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশে অধিকার বিস্তার করেন। উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের অংশবিশেষে তাঁর আধিপত্য ছিল। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে আরাকান ও ত্রিপুরারাজের বিরুদ্ধেও তিনি লাভ করেছিলেন সাফল্য।একমাত্র অহোম রাজ্যের বিরুদ্ধেই তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। এ কথা বললে ভুল হবে না যে, বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে তাঁর রাজত্বকালেই বাংলার মুসলিম রাজ্যের শৌর্যবীর্য সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্যম পেয়েছিল।

সোনারগাঁও-এর গোয়ালদী মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ৯২৫ হিঃ/ ১৫১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত আলাউদ্দিন হুসেন শাহ রাজত্ব করেন। ঐ একই বৎসর হতে তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৪৯৩ খ্রিঃ হতে ১৫১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বৎসর সাফল্যজনক রাজত্বের পর হুসেন শাহের মৃত্যু হয়। বাবরের আত্মকাহিনী হতে জানা যায় যে, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল।

হুসেন শাহ সাধারণ অবস্থা থেকে নিজ ক্ষমতাবলে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ অত্যাচার ও অনাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। যদিও তাঁর রাজত্বকালের বেশির ভাগ সময় কেটেছিল যুদ্ধ-বিগ্রহে। তথাপি এতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয়নি। বরং এটি তাঁর সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থারই পরিচায়ক। সুশাসক হিসেবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকেই যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিজয় গুপ্ত কর্তৃক ১৪৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত মনসাঙ্গমল কাব্যে হুসেন শাহের শাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁকে 'নৃপতি তিলক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শাসনক্ষেত্রে হুসেন শাহ যে উদার ধর্মীয় নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা বিভিন্ন উচ্চ রাজপদে হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ হতে বোঝা যায়। রাজকর্মচারীদের নিয়োগে তিনি নি:সন্দেহে ধর্ম অপেক্ষা যোগ্যতার সম্মান দিয়েছেন।তাঁর রাজ্যের উজির ছিলেন পুরন্দর খান। গৌড় মল্লিক নিযুক্ত হয়েছিলেন ত্রিপুরা অভিযানে সেনাপতি। রূপ ও সনাতন দুই ভাই ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কর্মচারী। রূপ ছিলেন 'সাকর মল্লিক' (মন্ত্রী বিশেষ) ও সনাতন ছিলেন 'দবীর খাস' (ব্যক্তিগত কর্মাধ্যক্ষ)। মুকুন্দ দাস ছিলেন তাঁর প্রধান চিকিৎসক। তাঁর দেহরক্ষী ছিলেন কেশবছত্রী। অনুপ ছিলেন মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় স্থানীয় ভুস্বামী ছিলেন রামচন্দ্র খান। হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাসের পরিবারের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। জগাই ও মাধাই নবদ্বীপের কোতওয়াল ছিলেন। হুসেন শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তাগণও হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলা ভাষায় মহাভারত প্রণেতা কবীন্দ্র পরেমশ্বর ও শ্রীকর নন্দী চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেছিলেন।

হুসেন শাহ কর্তৃক সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি আচরণ, উড়িষ্যা অভিযানকালে হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং জয়ানন্দ কর্তৃক নবদ্বীপের হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের নির্মম আচরণের উল্লেখ করে অনেক ঐতিহাসিক হুসেন শাহের হিন্দু বিরোধী মনোভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু এই সব ঘটনার প্রত্যেকটির পিছনেই ছিল কোন না কোন কারণ। স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি রায়কে শাস্তি দান, রাজ্য জয়কালে হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং রাজদ্রোহিতার অপরাধে নবদ্বীপের হিন্দুদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এ সব ঘটনাকে ধর্মীয় নীতির পরিচায়ক বলা বোধহয় যুক্তি সঙ্গত হবে না। উচ্চ রাজপদে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চয়ই তাঁর ধর্মীয় উদারতার পরিচয় বহন করে। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণ দাস কবিরাজের লেখনিতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হুসেন শাহ শ্রী চৈতন্য দেবকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং তিনি চৈতন্য দেবকে

অবতার বলে মনে করতেন। চৈতন্য দেবের গৌড় আগমনের সময় হুসেন শাহ তাঁর কর্মচারীদের তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের উদারতাই বিভিন্ন হিন্দু লেখককে তাঁকে 'নৃপতিতিলক', 'জগৎভূষণ', 'কৃষ্ণাবতার' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করতে প্রবুদ্ধ করেছিলেন।

হুসেন শাহ আরবি ও ফার্সি সাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম স্মরণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরাগল খান ও ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত প্রণয়ন করেছিলেন। সুতরাং আলাউদ্দিন হুসেন শাহের উদারনীতি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

হুসেন শাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি মালদহে একটি বিরাট মাদ্রাসা নির্মাণ, পান্ডুয়াতে নূর-কুতুব-ই-আলমের দরগাহ্‌তে বহু সম্পত্তি ও অর্থ দান করেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করান। কথিত আছে যে, প্রতি বৎসর তিনি পায়ে হেটে রাজধানী একডালা হতে পান্ডুয়াতে এসে এই সুফির দরগাহে সম্মান প্রদর্শন করতেন। স্থাপত্যক্ষেত্রেও হুসেন শাহের অবদান রয়েছে। ইলিয়াসশাহী যুগে বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য শিল্পক্ষেত্রে যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল হুসেন শাহের সময়েও সেই ধারার প্রচলন অব্যাহত ছিল। তাঁর সময় নির্মিত বহু মসজিদের মধ্যে গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' এবং 'গুমতিদ্বার' শিল্প সৌন্দর্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

মধ্যযুগীয় বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকাল নি:সন্দেহে অত্যন্ত গৌরবজনক। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে হুসেন শাহ রাজ্যসীমা সম্প্রসারণে প্রভুত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দেশের জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় আবার বাংলায় শৌর্যবীর্যের যুগের সূচনা হয় যা ছিল আলাউদ্দিন হুসেন শাহেরই কৃতিত্ব। যদিও তাঁর কৃতিত্বের সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আজও আলাউদ্দিন হুসেন শাহের জনপ্রিয়তা তাঁর কৃতিত্বের ও সাফল্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফ্‌ফর নসরৎ শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে নসরৎ শাহ যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পিতা কর্তৃক মুদ্রা প্রকাশের ক্ষমতাও পেয়েছিলেন। ৯২২ হি:/১৫১৬ খ্রি: ও ৯২৩ হি:/ ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মুদ্রা তাঁর যুবরাজ অবস্থায় প্রকাশিত মুদ্রা বলে মনে করা হয।

নসরৎ শাহ যখন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরির্তন ঘটছিল উত্তর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে। ইব্রাহিম লোদির দুর্বলতার সুযোগে লোহানী ও ফার্মুলী আফগানগণ পাটনা হতে জৌনপুর অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লোহানী বংশের শাসন। নসরৎ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আজমগড় পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন। প্রায় সমগ্র উত্তর বিহার অধিকার করে নসরৎ এই অঞ্চলের শাসনভার আলাউদ্দিন ও মখ্‌দুম আলমের ওপর অর্পন করেন। এ সময় গন্ধক ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় এই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর লোদি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে উত্তর ভারতের অধীশ্বর হন। বাবরের অভ্যুদয় ও লোদি সাম্রাজ্যের অবসান বাংলার মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। পলায়মান আফগান নেতাগণ নসরৎ শাহের সাহায্যপ্রার্থী হলেমানবিক কারণে নসরৎ শাহ তাঁদের সাহায্য করেন।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর গোগরা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি মোল্লা মুহাম্মদ মাজহার নামক একজন দূত নসরৎ শাহের কাছে পাঠিয়ে নসরৎ-এর মনোভাব জানতে চাইলে নসরৎ-এর জন্য সমস্যা দেখা দেয়। তিনি

কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বাবরের দূতকে প্রায় এক বৎসরকাল নিজ দরবারে রেখে দিলেন। শেষ পর্যন্ত নসরৎ নিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন করেন এবং নসরৎ-এর পাল্টা দূত ১৫২৯ খিস্টাব্দে বাবরের দরবারে নসরৎ কর্তৃক প্রেরিত বহু উপঢৌকন নিয়ে হাজির হন। এ ক্ষেত্রে বাবর নসরৎ-এর নিরপেক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। সম্ভবত আফগান নেতৃবর্গ ও নসরৎ-এর মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা না থাকায় বাবর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে বিহারে বাবরের বিরুদ্ধে আফগান নেতাদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপিত হয় তাতে নসরৎ শাহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে মনে হয় না। মাহমুদ লোদির নেতৃত্বে মুঘল বিরোধী যে আঁতাত গড়ে উঠেছিল তাতে নসরৎ-এর যোগদানের কোন উল্লেখ বাবরের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়নি। মাহমুদের নেতৃত্বে আফগান নেতা বায়েজীদ, বীবন, ফতেহ খান ও শের খান সুরের যে জোট স্থাপিত হয় তাতে জালাল খান লোহানী ও জালাল খান শর্কী স্বভাবতই যোগদান করেননি। কারণ তাঁদের নিজ নিজ অধিকার অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্য ছিল। একই উদ্দেশ্যে জালাল লোহানী ও জালাল শর্কী বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং এ ধরনের মুঘল বিরোধী আঁতাতে নসরৎ-এর যোগদানে তাঁর নিজস্ব কোন স্বার্থ তো ছিলই না বরং স্বরাজ্যের প্রতি মুঘল আক্রোশ উত্থাপনের আশঙ্কার প্রকাশ ঘটে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নসরৎ-এর পক্ষে মুঘলদের সাথে সংঘর্ষ পরিহার করা সম্ভব হয়নি। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতাগণ বাবরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। গঙ্গা নদীর উভয় তীর অনুসরণ করে মাহমুদ লোদি এবং শের খান চুনার হতে বারাণসী অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। বীবন ও বায়েজীদ গোগরা অতিক্রম করে গোরক্ষপুর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। বাবরও সসৈন্যে এগিয়ে যান বিহার অভিমুখে। মাহমুদ লোদি বাবরের আগমনে যুদ্ধ না করে মহোবার দিকে পলায়ন করেন। শের খান বারাণসী অধিকার করেই বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এছাড়া জালাল খানও বক্সারের নিকট বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এসময় বাবর তীরহুত অধিকার করে গঙ্গা ও গন্ধকের সঙ্গমস্থলে বীবন ও বায়েজীদের অধীন আফগান সৈন্যদলকে পরাজিত করেন। ফলে বাবরের সৈন্যদল বাংলার সৈন্যদলের সম্মুখীন হন। বক্সারের শিবির হতে বাবর দূত পাঠিয়ে নসরৎ-এর সৈন্যদলকে গোগরা নদীর তীর ত্যাগ করতে আদেশ দেন। নসরৎ উত্তর দিতে বিলম্ব করলে একমাস কাল অপেক্ষা করে বাবর পুনরায় নসরৎ-এর কাছে দূত পাঠালেন। এ সময় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং তিন দিন ধরে যুদ্ধ চলে। বাংলার পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌবাহিনী যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেও মুঘল রণকৌশলের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। ফলে গোগরা নদীর পূর্বতীরে স্থাপিত হয় বাবরের আধিপত্য এবং আফগান জোটের পরাজয়ের পথ হয় সুগম। কূটনৈতিক কারণে বাবর বিহার ও অযোধ্যা জয়ের পূর্বে বাংলা আক্রমণ করা সমীচীন মনে করেননি। এ সময় বাবর কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী বাংলার সুলতান স্বীকার করে নেন। ফলে মুঘলদের প্রত্যক্ষ আক্রমণের হাত থেকে বাংলার মুসলিম রাজ্য রক্ষা পায়।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হলে নসরৎ শাহ স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলার সুযোগ পেলেন। বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ূন এ সময় বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর মাহমুদ লোদি পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন। বীবন খান, বায়েজীদ খান ও শের খান জৌনপুর হতে বিতাড়িত করেন মুঘল সৈন্য। মাহমুদ লোদির বিরুদ্ধে দাওরার যুদ্ধে বীবন খান ও বায়েজীদ খান নিহত হন। শের খান আবার মুঘল বশ্যতা স্বীকার করলেন। মাহমুদ লোদি পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন। হুমায়ূন বাংলা আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নসরৎ শাহ এ সময় হুমায়ূনের রাজ্যের অপর সীমান্তের শত্রু গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সাথে মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে দূত হিসেবে পাঠান মালিক মরজানকে। এসময় বাহাদুর শাহ হুমায়ূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন গ্রহণ করছিলেন। সংবাদ পেয়ে হুমায়ূন বাংলার বিরুদ্ধে আর অগ্রসর না হয়ে গুজরাট অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। নসরৎ শাহের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা-গুজরাটের মৈত্রী পরিপূর্ণভাবে কার্যকর না হলেও নসরৎ-এর সময়োপযোগী কূটনীতি বাংলাকে আসন্ন যুদ্ধ হতে রক্ষা করে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার মুসলিম রাজ্যকে যুদ্ধে লিপ্ত না করে নসরৎ শাহ দুরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন।

নসরৎ শাহ তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য সীমান্তে দৃষ্টি দেয়ার মতো অবকাশ তাঁর ছিল না। কামতার মুসলমান শাসনকর্তা নিজ উদ্যোগেই অহোম রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। সেনাপতি তুরবক অহোম সৈন্যদলকে পশ্চাদপদ হতে বাধ্য করেছিল। এই অভিযানের পরিসমাপ্তি দেখার পূর্বেই ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়।

উড়িষ্যা সীমান্তেও কিছু সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। তাই উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব নিজ রাজ্যসীমা সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন। তবে তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগিজরা বাংলায় ঘাঁটি স্থাপনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। সিলভেয়ার অগমনের পর হতে পর্তুগীজরা প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলায় জাহাজ পাঠাতো।

পিতার ন্যায় নসরৎ শাহও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি রচনায় তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি শেখর ছিলেন নসরৎ শাহের কর্মচারী। স্থাপত্য শিল্পেও তাঁর অবদান রয়েছে। গৌড়ের বিখ্যাত বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ তাঁর অমর স্থাপত্যকীর্তি। গৌড়ের কদমরসুল ভবনে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করান। যদিও নসরৎ শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। তথাপি বিভিন্ন বিবরণে জানা যায় যে, তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মুদ্রা প্রমাণে মনে করা যায় যে, নসরৎ শাহ তাঁর ভাই মাহমুদ শাহকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীন হতে জানা যায়,রাজ্যের একদল আমীরের সহায়তায় ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। মাত্র নয় মাস কাল শাসনের পর মাহমুদ শাহ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। ফিরোজ শাহের স্বল্পকালীন রাজত্বের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় না। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পূর্বে অহোম রাজ্যের সাথে যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল তা তাঁর রাজত্বকালেও অব্যাহত ছিল। ফিরোজ শাহ যুবরাজ থাকাকালীন তাঁর আদেশে শ্রীধর কবিরাজ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। এ থেকে ধারণা করা হয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় ফিরোজও বাংলা সাহিত্যে উৎসাহী ছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পাঁচ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে হুসেন শাহী বংশের অবসান ঘটে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পাঁচ বৎসর ছিল পরিবর্তনের যুগ। শের খান সুরের নেতৃত্বের আফগান শক্তি পুনরুত্থানের চাপে বাংলায় হুসেন শাহী বংশের শাসনের এবং একই সাথে দীর্ঘ দুই শতবর্ষব্যাপী স্বাধীন সুলতানি আমলের অবসান ঘটে।

বিহারের হাজীপুরের শাসনকর্তা মখদুম আলমের বিদ্রোহ এই পতনের সূচনা করে। মখদুম আলম শের খান সুরের সাহায্য পায়। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ জালাল খান লোহানীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে মখদুম আলমকে দমন করতে সচেষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সম্মিলিত শক্তি শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুরজগড়ের যুদ্ধে জালাল খানের পরাজয় শের খান সুরের পক্ষে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত জয়ের সুযোগ এনে দেয়।

এই বিজয়ের পথ ধরেই শের খান সুর গৌড় পর্যন্ত এসে উপস্থিত হন। দ্বিতীয় বার গৌড় আক্রমণ করে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল শের খান গৌড় অধিকার করেন। মাহমুদ বিহারের হাজীপুরে পলায়ন করে হুমায়ূনের সাথে জোট বেধে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর দুই পুত্রের হত্যার কথা শুনে তিনি শোকে ও নিস্ফল আক্রোশে হুমায়ূনের শিবিরেই প্রাণত্যাগ করেন।

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম পর্তুগিজগণ বাংলায় বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করার সুযোগ পায়। পর্তুগিজ সাহায্যের আশায় তিনি চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও-এ পর্তুগিজ ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এবং তাঁর বংশধরগণ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল বাংলা শাসন করেন। বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের ইতিহাসে এটি ছিল এক গৌরবোজ্জল যুগ। রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা এবং ধর্ম , সাহিত্য ও শিল্পকলা ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উৎকর্ষ ছিল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। দিল্লির লোদি সুলতানদের ক্ষীণ অবস্থায় এবং হুসেন শাহী বংশের প্রথম দুজন সুলতানের সামরিক ও কূটনৈতিক কৃতিত্বের ফলে পশ্চিমে গোগরা এবং গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থল হতে পূর্বদিকে চট্টগ্রাম এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কামতা-কামরূপ হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মন্দারণ ও চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ভূ-খন্ডে হুসেন শাহী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লির সুলতানের সাথে বিবাদের সুযোগে হুসেন শাহ ভাগলপুরের পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন এবং এই কৃতিত্বের স্মারকস্বরূপ তিনি 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি লাভে সমর্থ হন। রাজ্যচ্যুত শর্কী সুলতানকে ভাগলপুরে আশ্রয়দান বাংলার মুসলিম রাজ্যকে দিল্লির প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে।

রাজ্যজয় এবং দিল্লির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বূহ্যকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল হুসেন শাহী শাসনের প্রতি জনগণের আনুগত্য। হুসেন শাহী শাসকগণ তা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা এদেশীয় অভিজ্ঞ লোকদের শাসনকার্যে সম্পৃক্ত করেন। রাজকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে উদারতা হুসেন শাহী যুগে পরিলক্ষিত হয় তা শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ফলে রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছিল এবং একই সাথে অন্যান্যক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পথ সুগম হয়েছিল।

দিল্লির প্রভাব হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় এ যুগেই বাংলা খুঁজে পায় তার সাংস্কৃতিক সত্তা। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে নবজাগরণ এ যুগে সূচিত হয় তা এদেশীয় জনগণের মেধা ও মননশীলতারই স্বত:স্ফূর্ত অভিব্যক্তি যা বহুদিন যাবৎ চাপা পড়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শাসকবর্গের উদারনীতি এই নবজাগরণের দ্বারকে করেছিল উন্মুক্ত। এছাড়া চৈতন্যদেবের জন্ম এ যুগকে দান করেছিল নতুন মহিমা। ভক্তি মতবাদ ও এ সম্পর্কীয় সাহিত্য এ সময়ে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছিল।

সর্বদিক বিবেচনা করে এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, হুসেন শাহী যুগেই প্রথম বাংলার মুসলিম রাজ্য স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত এক শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই যুগের কৃতিত্ব বাস্তবিকই এই যুগকে বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল যুগরূপে চিহ্নিত করেছে।

সারসংক্ষেপ

হাবশী শাসনের পর সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। উড়িষ্যা হতে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকাঞ্চল পর্যন্ত তাঁর নাম সুপরিচিত ছিল। সুশাসনই এ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ। সামান্য চাকুরি হতে নিজ যোগ্যতা বলে হুসেন শাহ বাংলার সুলতান হন। ২৬ বছরের রাজত্বে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধিতে সক্ষম হন। হোসেন শাহ মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান ইত্যাদি নানা কারণে একজন উল্লেখযোগ্য সুলতান। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তাঁর আমলের বিশেষবৈশিষ্ট্য। উত্তরসুরী নসরৎ শাহও রাজ্যশাসনে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। বিশেষ করে বাবরের বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণ নসরৎ শাহের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পিতার ন্যায় তিনিও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গৌড়ের বিখ্যাত বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ তাঁর অমর স্থাপত্যকীর্তি। পরবর্তী সুলতানদের আমলে হুসেন শাহী যুগের শক্তিক্ষয় ঘটে ও পতন ত্বরান্বিত হয়। সামগ্রিকভাবে একথা বলা যায় যে, হুসেন শাহী যুগেই বাংলার মুসলিম রাজ্য স্থানীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত এক শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শ্রী চৈতন্যদেব কোন সুলতানের সমসাময়িক?
(ক) নসরৎ শাহ (খ) গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
(গ) আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (ঘ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

২। হুসেন শাহের রাজত্বকালে কারা প্রথম বাংলায় পদার্পণ করেন?
(ক) ইংরেজগণ (খ) ফরাসিরা
(গ) পর্তুগিজগণ (ঘ) আরবিয়রা।

৩। দানিয়েলের ওপর কোন রাজ্য অর্পণ করা হয়?
(ক) আসাম (খ) কামরূপ
(গ) উড়িষ্যা (ঘ) ত্রিপুরা।

৪। চট্টগ্রামের ওপর হুসেন শাহী শাসকদের অধিকার ছিল কতোদিন পর্যন্ত –
(ক) ১৫১৭ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (খ) ১৫০০ থেকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
(গ) ১৫২৭ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (ঘ) ১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

৫। হুসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' আখ্যা দেয়া হয়েছে কোন কাব্যে?
(ক) চৈতন্য চরিতামৃত কাব্যে (খ) মহাভারত মহাকাব্যে
(গ) মনসামঙ্গল কাব্যে (ঘ) চৈতন্য ভাগবত বাক্যে

৬। নসরৎ শাহের অমর স্থাপত্যকীর্তি কোনটি?
(ক) ঝনঝনিয়া মসজিদ (খ) লোটন মসজিদ
(গ) ছোট সোনা মসজিদ (ঘ) বারদুয়ারী মসজিদ।

৭। হুসেন শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হয়–
(ক) ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের বাল্যজীবন ও ক্ষমতা লাভ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। দুলাল গাজি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। হুসেন শাহী যুগকে কেন বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। হোসেন শাহী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করুন। এই আমলে বাংলার অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সামরিক অভিযানসমূহের সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ করুন। তাঁর সাম্রাজ্য কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৩। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। তাঁকে কি মধ্যযুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ মুসলিম সুলতান বলা যায়?

৪। মুগল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার মুসলিম রাজ্য রক্ষায় সুলতান নসরৎ শাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। M.R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal.*

২। আবদুলকরিম, *বাংলার ইতিহাস।*

৩। সুখময়মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল।*

৪। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৫। আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস।*

পাঠ - ৬

হুসেন শাহী যুগের গৌরব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- হুসেন শাহী যুগের গৌরব সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা পাবেন ;
- এ যুগের প্রশাসনিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র পাবেন ;
- ধর্মীয় জীবন এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষের তথ্যপাবেন ;
- শিল্পকলা ও স্থাপত্যের স্বকীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

হুসেন শাহী যুগের গৌরব

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে হুসেনশাহী শাসনকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সাহিত্য, শিল্পকলা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উৎকর্ষ ছিল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এ সময় বাংলা রাজনৈতিকভাবে উত্তর ভারত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল যা এ অঞ্চলকে এনে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য। স্থানীয় পন্ডিতদের প্রচেষ্টায় এ যুগে সাহিত্যিক পুনর্জাগরণ ঘটে যা পূর্ববর্তী সময় অবদমিত ছিল। নতুন শিল্পকলা উদ্ভাবনের সাক্ষ্য রাখতে না পারলেও সমকালীন চারুকলা ও স্থাপত্যের নিদর্শন বাংলার সমৃদ্ধি ও উন্নয়নেরই পরিচয় বহন করে। হুসেন শাহী যুগের শাসকগণ তাঁদের বিদেশী পূর্বসুরীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিমদের স্থানীয় আকাঙ্ক্ষা ও উন্নয়নের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিল। তাঁরা এ সময় কমবেশী পরিচিত হয়েছে দেশজ সংস্কৃতির সাথে। হুসেন শাহী যুগ ছিল বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমনের যুগ। একই সাথে মুগলরাও বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকায় এসে পৌঁছেছিল। তবে তখন পর্যন্ত ইউরোপীয়রা এখানে ভালভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারেনি। বাংলার নতুন শক্তির প্রাথমিক চিহ্নের সাক্ষ্য হুসেন শাহী যুগে পরিলক্ষিত হয়েছে যা পরবর্তী শতাব্দীতে দেশের জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণ করেছিল। আর তাই এ যুগকে বাংলার ইতিহাসের "স্বকীয়তার রূপদায়ক কাল" রূপে চিহ্নিত করা যায়।এ যুগের গৌরব পরিলক্ষিত হয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, অর্থনীতি, ধর্মীয় জীবনযাত্রা, শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

প্রশাসন

হুসেন শাহী যুগ বাংলায় এক সুদৃঢ় প্রশাসন ব্যবস্থার সূচনা করে। প্রশাসনিক অনিয়ম রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে কাজ করছিল বলে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ পাইকদের ভেঙ্গে দেন এবং আবিসিনীয়দের ধ্বংস করেন। কারণ, এদের ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্যমূলক কাজ দেশে সহিংসতার সৃষ্টি করেছিল। তিনি গৌড় থেকে একডালা পর্যন্ত প্রশাসনিক ইউনিট তৈরি করে নিজেকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে দক্ষ গভর্নর নিয়োগ করে রাষ্ট্রদ্রোহীদের সরিয়ে দেন।

এ সময় বাংলার প্রশাসনকে দিল্লি সালতানাতের প্রশাসনের অনুরূপ মনে করা হতো। এ যুগের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সব নীতি প্রণয়ন করেছিলেন সেগুলো তাঁর উত্তরসুরী নসরৎ শাহ, ফিরোজ শাহ এবং মাহমুদ শাহ কর্তৃক তেমন পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হয়নি। আরব, পাঠান,

মোগল ও বাঙালি জাতির সমন্বিত অভিজাত শ্রেণী এ সময় প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাছাড়া হুসেন শাহী বাংলার শাসকরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর ভারতীয় প্রশাসকদের চেয়ে কোন দিক থেকে ভিন্ন ছিল না। সামরিক গভর্নররা কর ধার্য করতো। এসময় উজির ছিলেন প্রধান প্রশাসক। কেন্দ্রে তিনি অর্থনৈতিক ও সামরিক বিভাগের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। কখনো কখনো তিনি সুলতানের পদমর্যাদা লাভ করতেন। হুসেন শাহী যুগের প্রদেশগুলো পরিচিত ছিল ইকলিম (Iqlim), মুলক (Mulk), আরসাহ (Arsah), হিসেবে। এগুলোর মধ্যে ছিল চাট্গাঁ মুয়াজ্জামাবাদ, মাহমুদাবাদ, মুহাম্মদাবাদ, ফতেহাবাদ, খলিফাতাবাদ, হুসাইনাবাদ, নুসরাতাবাদ, বরবকাবাদ, সাতগাঁও, সাজলামানকবাদ, হাজিপুর (উত্তর বিহার), মুঙ্গের (দক্ষিণ বিহার) এবং নতুনভাবে জয় করা কামরূপ ও কামতা। প্রত্যেকটি প্রদেশ "সর-ই-লস্কর- আ-উজির" নামক কর্মকর্তা দ্বারা শাসিত হতো। তাঁর অধীনে সামরিক এবং রাজস্ব কার্যাবলীও থাকতো। তবে প্রাদেশিক প্রশাসন সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক রকম ছিল না। হুসেন শাহী শাসন ছিল ধর্মীয় উগ্রতামুক্ত। সকল শ্রেণীর ও ধর্মের লোক এ যুগে নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করতে পারতো। রাজনৈতিক উদার মানসিকতা দ্বারা শাসকরা প্রণোদিত হতো যা দেশের উন্নতির জন্য ছিল অত্যন্ত সহায়ক। হুসেন শাহী যুগে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ধীরে ধীরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুন:স্থাপিত হয় যা বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক দিগন্তে।

অর্থনীতি

বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান ও লিপিমালা থেকে হুসেন শাহী যুগে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথ্য পাওয়া যায়। ভার্থেমা, বারবোসা ও টোমে পিরেজ-এর ষোড়শ শতাব্দীর এবং পরবর্তীকালের জোয়া দ্যা ব্যারসের লেখনিতে এবং বাংলা কবিতা, ফার্সি সাহিত্য ও লিপিমালা এ যুগের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাক্ষ্য বহন করে। বাংলা প্রধানত কৃষি, ব্যবসা এবং শিল্প সম্পদে এ সময় সমৃদ্ধ ছিল। এ যুগে নগর ও গ্রামে বসবাসরত জনগণের আনুপাতিক হার সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। মধ্যযুগের বাংলা ছিল মূলত: কৃষি নির্ভর । তাই বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করতো এবং তাদের সংখ্যাও ছিল শহর ও নগর থেকে বেশি। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল যা সামগ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতিকে করেছিল সুদৃঢ়। এ যুগের গ্রামগুলো ভূমি এবং এর উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া সীমিত কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেও সম্পৃক্ত ছিল। তুলনামূলকভাবে শহর এবং নগরের লোকেরা ছিল প্রশাসন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত। এ সময় রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শহর ও নগরের মধ্যে ছিল গৌড়, পান্ডুয়া, সাতগাঁও, চট্টগ্রাম এবং সোনারগাঁও। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তাঁর রাজধানী একডালায় স্থানান্তর করলেও বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিককালে গৌড় এবং পান্ডুয়ার গুরুত্ব কম ছিল না। রাজনৈতিক কেন্দ্র থেকে দূরে হলেও বাংলার জনগণের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে এ দুটি নগরের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় টাকশালে নগরগুলো গড়ে উঠেছিল নদী তীরবর্তী স্থানে। এগুলো শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্রই নয় বরং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সময় বাংলার বিভিন্ন বন্দরের মাধ্যমে চলতো সামুদ্রিক বাণিজ্য। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সপ্তগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এর ধর্মীয় পবিত্রতা এবং অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের কিছু জীবন্ত বর্ণনা ফুটে ওঠে সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও বিদেশীদের বিবরণে। শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত সোনারগাঁও থেকে এ যুগে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চাল ও কাপড় রপ্তানি হতো। কর্ণফুলী নদীর তীরে এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত চট্টগ্রামের অবস্থান ছিল বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অধিকার নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা এবং আরাকানের মধ্যে চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে সংঘর্ষ। 'পোর্ট গ্রান্ডে' হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রামে পর্তুগিজরা সুবিধা ভোগ করছিল। চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁওয়ের আকর্ষণীয় অবস্থানের কারণে এগুলোর ওপর পর্তুগিজদের ছিল লোলুপ দৃষ্টি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে তারা এ দুটো অঞ্চলের শুল্ক নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। জোয়া দ্য ব্যারোস-এর মানচিত্রে সাতগাঁও, সোনারগাঁও এবং চট্টগ্রামের অবস্থান থেকে উপলব্ধি করা যায় যে এ অঞ্চলগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সাথে বাংলার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রাথমিক দিকে বাংলা ছিল একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল, আর এর বেশির ভাগ লোক ছিল কৃষিজীবি।

এখানে বিভিন্ন প্রকার ধান প্রচুর উৎপাদিত হতো। এছাড়া অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল তুলা, আখ, আদা, হলুদ, সুপারী, ডাল ইত্যাদি। এ যুগে অভ্যন্তরীণ সামুদ্রিক বাণিজ্য বাংলার সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল। স্থানীয় বাজারে মহাজন, মুদ্রাবিনিময়কারী এবং বণিকদের কার্যক্রমের কথা দেশীয় সাহিত্যে একাধিকবার উল্লেখ আছে, যা এ যুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হুসেন শাহী যুগে বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের পূর্বশর্ত ছিল শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি। বাংলার বস্ত্রশিল্প এ যুগে লাভ করেছিল প্রসিদ্ধি। সুক্ষ্ম সুতিবস্ত্র, পাটবস্ত্র এবং রেশমী কাপড়ের উৎপাদন আকর্ষণ করেছিল বিদেশী ক্রেতাদের। এসময় বাংলায় উন্নতমানের চিনির উৎপাদন হতো। ধাতব শিল্পও এ যুগে লাভ করেছিল সমৃদ্ধি। যার ফলে গড়ে উঠেছিল স্বর্ণকার, কর্মকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক শ্রেণী।

হুসেন শাহী শাসকরা প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা ও কিছু স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন করেছিল। নসরৎ শাহ এবং মাহমুদ শাহ কিছু তামার মুদ্রা ব্যবহার করেছিলেন। এ যুগে কিছু উন্নতমানের রৌপ্য মুদ্রার আগমন ঘটেছিল যা ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্যের ইঙ্গিত বহন করে।

বিদেশীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সময় বাংলার উচুঁ শ্রেণীর লোকেরা ছিল সম্পদশালী। তবে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণ করা কঠিন। 'চৈতন্য ভগবত' গ্রন্থে অসংখ্য দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রয়েছে যা হুসেন শাহী আমলে বাংলার জনগণের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। সমকালীন দাস প্রথার উল্লেখ থেকে সমাজের কিছু অংশে দারিদ্রের চিহ্নও পাওয়া যায়। এতদ্বসত্ত্বেও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তার, পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি এবং সংগঠিত মূলধনী অর্থনীতির ফলে এ যুগে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসা, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা আশানুরূপ পরিবর্তন সাধনে বাধার সৃষ্টি করে। এসময় বিদেশী বণিকরাই বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। টোমে পিরেজ মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতার কথা বলেন। এগুলোর মধ্যে ছিল– আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাঙালি বণিকদের দূর্বল অবস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থা এবং নৌপরিবহন ক্ষেত্রে দক্ষ প্রযুক্তির অভাব এবং নিচুমানের ব্যবসা-নীতি। কৃষির প্রযুক্তি ছিল আদিম যুগের। তাই কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক মূলধন গঠন ছিল অসম্ভব।

ধর্মীয় জীবন

হুসেন শাহী যুগে বাংলার ধর্মীয় জীবনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল ইসলাম, বৈষ্ণববাদ, তান্ত্রিকবাদ মনসা এবং নাথ প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়। এ সময়ে ইসলাম মানুষের জীবনে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দেশজ সাহিত্যের সতর্ক পাঠে দেখা যায় যে, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক প্রকার লোকজ ইসলামের প্রচলন ছিল। এই জনপ্রিয় ইসলাম সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছিল বলেমনে করা হয়। মুসলমানদের মধ্যেমনসা পূজারও প্রচলন ছিল। নসরৎ শাহ নবীর পদচিহ্ন সংরক্ষণ করার জন্য একটি সৌধ তৈরি করেন। বৌদ্ধ ধর্মের এ ধরনের সংস্কার হিন্দু মতবাদ, খ্রিস্ট মতবাদ এবং ইসলামেও প্রবেশ করে। মুসলিম আধ্যাত্মবাদ এ সময় ইসলামে বিভিন্ন প্রকার তান্ত্রিক ও যৌগিক ধারণা ও রীতির আবির্ভাব ঘটায়। এ সময় 'আদিদেব' এবং 'আদ্যশক্তি' ছিল 'সংখ্য' ধারণার 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' পরিবর্ধিত সংস্করণ। মধ্যযুগের বাংলায়এগুলো ছিল বিবর্তনের মূলনীতি। এ যুগে বাংলার পীর সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুফিবাদ দ্বারা সমাজ এ সময় বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। চিশ্‌তিয়া সুফি নূর-কুতুব-ই-আলম ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি পনের শতকের প্রথমার্ধে মৃত্যুবরণ করেন। সাদ-উল্লাহ্‌পুরে নসরৎ শাহ সুফিআখি সিরাজউদ্দিনের সমাধি তৈরি করেছিলেন। নূর-কুতুব-ই-আলমের শিষ্য শেখ হুসামউদ্দিন মানিকপুরী এবং হামিদ শাহ এ সময়মানুষের ধর্মীয় জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলো। পনের শতকের প্রথম দিকে বাংলায় মাদারী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে এবং এর ধারাবাহিকতা হুসেন শাহী যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 'শূন্যপরাণ' গ্রন্থে মাদারী সম্প্রদায়ের 'দম মাদার' শ্লোগানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মওলানা শাহ দৌলাহ্ রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শেখ ইসমাইল গাজি এসময় ভক্তদের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত হয়েছিলেন। এ সকল পীর,

সুফিগণ যৌগিক এবং তান্ত্রিক দর্শন দ্বারা ইসলামি আধ্যাত্মবাদের সাথে একটি সাংস্কৃতিক সমন্বয় সৃষ্টি করেছিলেন। লিপি প্রমাণ ও সাহিত্যিক সাক্ষ্য থেকে শিয়া প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসময় বাংলার সাথে পারস্য ও ইরাকের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বারবোসা ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে বিভিন্ন পারসিক বণিকদের কথা উল্লেখ করেন। এসময় তারা সাফাভী শাসনাধীনে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা না পাওয়ায় দলে দলে বাংলায় অভিবাসন করে।

এ যুগে শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণববাদকে দিয়েছিলেন বাস্তব রূপ। চৈতন্য বৈষ্ণববাদের ইতিহাসের অত্যন্ত নিকটবর্তী হলেও তিনি সম্প্রদায়ের জন্য কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক পদ্ধতির নির্দেশ দেননি। বৈষ্ণববাদের প্রতি চৈতন্যর আবেগময় শ্রদ্ধা জনগণের মধ্যে এক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। ফলে বৈষ্ণববাদ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিল। এ যুগে বৈষ্ণববাদ সূচনা করেছিল বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্যের। চৈতন্য বর্ণ প্রথাকে বিলুপ্ত না করে সকল ধর্ম এবং বর্ণের মানুষের মনে বৈষ্ণববাদের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন। বৈষ্ণববাদের উদার মানসিকতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য রীতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যবাদের আবির্ভাবের ফলে বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ধর্মীয় সম্প্রীতির সৃষ্টি করেছিল।

এ যুগে রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলা ছিল মুসলিম প্রভাবাধীন। তাই হিন্দুরা ধীরে ধীরে মুসলিম ধ্যান-ধারণা ও রীতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। কিছু স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি ছিল ইসলামের সহানুভূতি। এ সম্প্রদায়গুলোর আধ্যাত্মবাদী ধারণা বিশেষ করে দর্শন পদ্ধতি ইসলামকে আকর্ষণ করেছিল। এ অবস্থায় মানুষ ব্যাপক হারে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। চৈতন্য পছন্দ করতেন ভক্তিময়তা। বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করেছেন যে, এ সময় মানুষ সাধারণত চন্ডী, মনসা, বাসুকী প্রভৃতি শাক্ততান্ত্রিক দেবতাদের পূজা করতো। যারা গীতা এবং ভগবত পাঠ করতো তাদেরও কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হতো না। সমকালীন লেখকগণ মনে করতেন ভক্তিমূলক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য চৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছিল। তাই বলা যায় যে, এ সময় বাংলায় বিরাজমান হিন্দু সমাজের দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য চৈতন্যের আগমন ঘটেছিল। বৈষ্ণববাদের উন্নয়নের ফলে বাংলায় ইসলামের প্রভাব বেশ কমে এসেছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্রোত ভেঙ্গে হিন্দুধর্ম পেয়েছিল নিরাপত্তা।

পনের ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় 'ধর্মঠাকুর'-এর পূজারি সম্প্রদায়ের বিশেষ অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। এর সাথে ইসলামি ধ্যান-ধারণার এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বিপ্রদাসের 'মনসা বিজয়' গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

হুসেন শাহী যুগে 'নাথ' ধর্মও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দর্শন হিসেবে প্রচার লাভ করে। এ সময়ে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ছিল 'মনসা' ও 'চন্ডি'র উপাসক' 'মনসামঙ্গল' কাব্য, 'চৈতন্য ভগবত' এবং মুকুন্দরামের 'চন্ডিমঙ্গল'-এ এই সম্প্রদায়গুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমকালীন বাংলায় তান্ত্রিক মতবাদও প্রসার লাভ করেছিল বলে জানা যায়।

তাই বলা যায় যে, হুসেন শাহী যুগে বাংলার রাজশক্তিতে মুসলিম ধর্মের প্রভাব থাকলেও এসময় বিভিন্ন স্থানীয় ধর্ম ও সম্প্রদায় সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্ড়র করেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামির ফলে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেছিল শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব মতবাদ। অতএব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল এ যুগের একটি গৌরবময় দিক।

সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য

হুসেন শাহী যুগ সংস্কৃত এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ উৎকর্ষের যুগ। এ সাহিত্যে প্রকাশ পায় মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব ধ্যান-ধারণা। এ সময় বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল যা ছিল দেশীয় সংস্কৃতির প্রতীক। বাংলার রাজসভার সাথে ফার্সি ভাষার সম্পর্ক থাকলেও সাধারণ জনজীবনে তা খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি; ফলে এসময় তেমন কোন ফার্সি সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। এ যুগে বাংলার শাসকগণ ছিলেন দেশীয় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী। তাই স্থানীয় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এগিয়ে

আসেন। সাধারণ জনগণের সাথে সুলতানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাঁরা বাংলা ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেন। ফলে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যা প্রাক্-মুসলিম যুগে সংস্কৃত ভাষার দখলে ছিল। এ যুগে বাংলা কবি যশোরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর দাস সরাসরি রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস কোন প্রকার রাজ পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও তাঁরা 'মনসার' অনুসারী সম্প্রদায়ের ওপর কবিতা রচনা করেন এবং হুসেন শাহের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল প্রবল। মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী হুসেন শাহের অধীনে চট্টগ্রামে নিয়োজিত শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী লেখকদের মধ্যে যশোরাজ খান হুসেন শাহের অধীনে কাজ করতেন। অন্যদিকে মুসলিম কবি শেখ কবির সম্পৃক্ত ছিলেন নসরৎ শাহের সাথে। ১৪৯৮ থেকে ১৪৯৯ সালের মধ্যে শেখ জাহিদ তাঁর যৌগিক দর্শন 'অদ্য পরিচয়' রচনা করেন। আর এটিই প্রথম যৌগিক ধারণা সম্পন্ন বাংলা কবিতা বলে মনে করা হয়।

বাংলা সাহিত্যের পার্থিব উপাদানের জন্যও এই যুগ বিশেষভাবে চিহ্নিত। 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধর নসরৎ শাহের পুত্র শাহজাদা ফিরোজের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। এর কিছুকাল পূর্বে মুসলিম কবি সাবিরিত খান অপর একটি 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেছিলেন। এ সকল কবিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র অনুসরণ করেন।

হুসেন শাহী যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময় পন্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'স্মৃতিতত্ত্ব' রচনা করেন যা থেকে সমকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের স্মৃতিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। রঘুনন্দন ছিলেন স্মৃতিজ্ঞানের চর্চা কেন্দ্র 'নবদ্বীপ' ধারার প্রধান উপস্থাপনকারী। তাঁর স্মৃতি চর্চা আজো গোঁড়া হিন্দু সমাজের সমাজিক ও ধর্মীয় আচরণে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। রঘুনাথ তার্কিক শিরোমণি কর্তৃক নবদ্বীপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নব্যন্যায়' ধারা। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে 'তত্ত্বচিন্তামণিদ্ধিত্' এবং 'পদার্থ খন্ডনম্' বিখ্যাত। ভারতে নব্যন্যায়-এর প্রভাব অব্যাহত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈত' মতবাদের ওপর ষোড়শ শতাব্দীতে লিখেছিলেন 'অদ্বৈতসিদ্ধি'। চৈতন্যের মৃত্যুর পর মুরারি গুপ্ত রচনা করেছিলেন 'চৈতন্য চরিতামৃত'। এসময় রাধা-কৃষ্ণের ওপরও নাটক রচিত হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল, রূপগোস্বামীর 'দানকেলি কৌমদি' 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব'। কাব্যের মধ্যে ছিল বৃন্দ্রন্যায়-র-'ভ্রমরদূত' রূপগোস্বামীর 'হংসদূত', 'উদ্ধব সন্দেশ'। এছাড়া 'রূপপদাবলী' গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের বেশকিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে।

স্থাপত্য ও শিল্পকলা

হুসেন শাহী যুগ স্থাপত্য ও স্থাপত্যের গাত্রালংকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় উল্লেখযোগ্য হারে স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। ধ্রুপদী সংগীতও রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলো। অসংখ্য আরবি ও ফার্সি লিপি ও মুদ্রা এ সময়ের হস্তলিপি শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় তুলে ধরে। এ যুগ ছিল এই শিল্পের 'নস্ক' ও 'সুল্স' রীতির উন্নয়নের যুগ। তবে আলংকারিক 'তুঘ্রা' রীতির তীর-ধনুক শিল্পকর্ম ছিল এসময়ের জনপ্রিয় গাত্রালংকার। 'তুঘ্রা' রীতি ছিল সুন্দর, ফুলেল এবংসাজানো। তাছাড়া চিত্র শিল্প ছিল নসরৎ শাহের আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 'সিকান্দর নামা' গ্রন্থের চিত্রণে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে।

হুসেন শাহী যুগ শুরু হওয়ার কালেই বাংলায় স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছিল। ইলিয়াস শাহের আমলে স্থাপত্য স্বতন্ত্র ঐতিহ্য লাভ করেছিল। হুসেন শাহী যুগ ছিল এরই ধারবাহিকতা। গৌড়ের দরাস্বাড়ী মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ এ সময়ের শক্তিশালী স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় বহন করে। হুসেন শাহী আমলে বাংলায় ইটের তৈরি স্থাপত্যের উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় লট্টন মসজিদ, গোমতি গেট, কদম রসুল, ঝনঝনিয়া মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ ইত্যাদিতে। দিনাজপুরের সুরা মসজিদ ও হেমতাবাদ মসজিদ, পাবনার বাঘা মসজিদ ও নবগ্রাম মসজিদ, ফরিদপুরের মজলিস আউলিয়া মসজিদ, সিলেটের শঙ্কর পাশা মসজিদ এবংসোনারগাঁর গোয়াল্দি মসজিদ হুসেন শাহী যুগের স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ যুগের স্থাপত্যের মধ্যে বাংলার জীবন ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ওপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহী আমল ছিল এক গৌরবময় অধ্যায়। প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ যুগ বাংলার অতীত ঐতিহ্যের ধারা যেমন বজায় রেখেছিল, তেমনি সমাজের সর্বস্তরে নতুন নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছিল। তাই হুসেনশাহী যুগ বাংলার মুসলিম শাসনামলের স্বর্ণযুগ।

সারসংক্ষেপ

হুসেনশাহী আমল বাংলার স্বাধীন সুলতানদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময়কাল। রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন এবংসাহিত্য, শিল্পকলা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উৎকর্ষ এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এ যুগেই বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই এ যুগকে 'স্বকীয়তার রূপদায়ক কাল' রূপে চিহ্নিত করা হয়। এ যুগে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে বাংলার সমৃদ্ধি ছিল দৃষ্টান্তমূলক। বিদেশিদের বর্ণনায় এ চিত্র ধরা পড়েছে। ধর্মীয় জীবনে এক ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যবাদের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুধর্মের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। হুসেন শাহী যুগে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্থাপত্য ও শিল্পকলায় বাংলার জীবন ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে এ যুগকে বাংলার মুসলিম শাসনামলের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি হুসেন শাহী যুগের প্রশাসনিক ইউনিট নয়?

(ক) আরসাহ (খ) ইকলিম

(গ) বিষয় (ঘ) মুলক।

২। হুসেন শাহের রাজধানী কোনটি?

(ক) সোনারগাঁও (খ) সাতগাঁও

(গ) একডালা (ঘ) গৌড়।

৩। কোন সুফি হুসেন শাহের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন?

(ক) শাহজালাল (খ) নূর-কুতুব-ই-আলম

(গ) শেখ হুসামউদ্দিন মানিকপুরী (ঘ) বায়েজীদ বোস্তামী।

৪। 'চন্ডিমঙ্গল'-এর রচয়িতা কে?

(ক) মুকুন্দরাম (খ) বিপ্রদাস

(গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর (ঘ) রঘুনন্দন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। হুসেন শাহী যুগের প্রশাসন ব্যবস্থার বিবরণ দিন।

২। স্থাপত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে হুসেন শাহী যুগের উৎকর্ষ বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। হুসেন শাহী যুগের গৌরব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।
২। ধর্মীয় জীবনে হুসেন শাহী যুগের অগ্রগতি আলোচনা করুন।
৩। সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে হুসেন শাহী যুগের অবদান মূল্যায়ন করুন।
৪। প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হুসেন শাহী যুগে কি কি অগ্রগতি সাধিত হয়? এই যুগের অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক বলা যায় কি?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। M.R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal.*
২। আবদুলকরিম, *বাংলার ইতিহাস।*
৩। সুখময়মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল।*
৪। আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৫। আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস।*

পাঠ - ৭

সুলতানি আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতানি আমলে বাংলার প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- বাংলায় ইসলামে ধর্মান্তকরণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- মুসলিম সমাজ গঠন ও হিন্দু-মুসলিমের সামাজিক সংমিশ্রণ বিষয়ে অবহিত হবেন ; এবং
- সুলতানি আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ধারণা পাবেন।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্র অঞ্চলের সমাজে নতুন উপাদান যুক্ত হয় এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এতদিন পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধ, হিন্দু এবং লোকাচার ধর্ম পালনকারী বিপুল সংখ্যক লোকজন ছিল; মুসলমানরা নিয়ে আসে নতুন ধর্ম ইসলাম। মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে বিদ্বান, পেশাধারী, স্থপতি, প্রশাসক এবং কারিগরগণও এদেশে আসেন। একই সঙ্গে বাংলার সামাজিক জীবনে পীর, সুফি, ফকির প্রমুখ ধর্মীয় লোকজনেরও আগমন ঘটে যারা অত্র অঞ্চলে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

ভৌগোলিক দিক থেকে উপমহাদেশের সর্বপূর্বে অবস্থিত বাংলার একটি আঞ্চলিক সত্তা রয়েছে। এদেশের অবস্থান পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী এবং জলবায়ু জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। বাংলা একটি প্রাকৃতিক সীমান্তবেষ্টিত দেশ, এর উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া ও চট্টগ্রাম পাহাড় এবং পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, বীরভূমের সাঁওতাল পরগণা, ঝাড়খন্ড এবং ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। উত্তর-দক্ষিণে বাংলা সুরক্ষিত, বহিরাক্রমণের আশঙ্কা তেমন ছিল না; পূর্বদিক থেকেও বহিরাক্রমণের ঘটনা দেখা যায় না, দক্ষিণে আরাকানের সঙ্গে বাংলার সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেলেও তা তেমন একটা বিপদ ডেকে আনেনি। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে পশ্চিম হতে বাংলা প্রায়ই আক্রান্ত হতো। পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বহিরাক্রমণের ফলেই বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে বেশি। বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে গঙ্গানদী, আক্রমণকারীরা গঙ্গা দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। এই নদীর ধারে রাজমহলের গিরিপথে অবস্থিত ছিল তেলিয়াগড় এবং সিকড়িগড় নামে দুটি সুরক্ষিত গড় বা দুর্গ। এই দুটি গড় রক্ষা করতে পারলে বাংলা বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পেতো। প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম আমলের শেষ পর্যন্ত এই গিরিপথ এবং দুর্গগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার এই ভৌগোলিক অবস্থা এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনের ওপরও বহুবিধ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বাংলার 'আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব' বা স্বকীয় সত্তা হিসেবে এ অঞ্চলের পরিচয় দান করেছে।

বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ

বখতিয়ার খলজী বাংলায় প্রথম মুসলিম রাজ্য বিস্তার করেন। প্রথম দিকে লখনৌতিকে রাজধানী করে এর অবস্থান গড়ে ওঠে। তখন থেকে অন্যান্য অংশে মুসলমান শাসন বিস্তার লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় তা প্রাধান্য বিস্তার করে।

খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলার সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য, আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পরম্পরাগত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন তথ্য বিবরণী থেকে বলা যায় যে, তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের আগে থেকেই বাংলার সঙ্গে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এ যোগাযোগ ছিল একান্তভাবেই বাণিজ্যিক। চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথ বর্ণনাকালে আরব ভৌগোলিকগণ একটি দেশ ও সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখ করেছেন যা যথাক্রমে বাংলা ও চট্টগ্রাম হিসাবে সনাক্ত করা যায়। এসব সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায়, আরব ব্যবসায়ীরা বাংলার উপকূলে ও সামুদ্রিক বন্দরে যাতায়াত করতেন। মাঝে মাঝে ব্যবসায় সুবিধার জন্য তারা বাংলায় দীর্ঘদিন অবস্থান এবং উপকূলীয় এলাকায় মানুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করতেন। তবে সেই প্রাথমিক আমলে বাংলায় কোন সুফির আগমন ঘটেছিল কিনা এবং তাঁরা স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন কিনা তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার উৎপাদিত পণ্যের বহির্বিশ্বে চাহিদা ছিল। আরব বণিকগণও বাংলার সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। তবে বাংলায় ইসলাম প্রচার এবং মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি বিজয়ের সময় থেকেই শুরু হয়।

বাংলায় ইসলাম বিস্ড়র

সুলতানি আমলে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর ঘটনা হলো এই অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার। বাংলা একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। ১৮৭২ সালে প্রথম ভারতীয় আদমশুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বিষয়টি বিজ্ঞজনদের নজর কাড়ে। কিন্তু বাংলার এই মুসলিম প্রাধান্যের কারণ সম্পর্কে পন্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। এ বিষয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন যুক্তি, তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। পন্ডিতদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী বলার চেষ্টা করেছেন যে, বল প্রয়োগ করেই মুসলমান শাসকগণ বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তবে এই মতটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। বাংলার মুসলিম প্রাধান্যের কারণ অনুসন্ধানে অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদটি হল 'পারসুয়েশন থিওরী' বা প্রচারণামূলক মতবাদ। বিভিন্ন সময়ে বাংলায় আগত সুফি-দরবেশদের হৃদয়গ্রাহী প্রচারণার ফলেই বাংলায় ইসলামের বিস্তার ঘটেছে।

বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠন তথা ইসলাম বিস্তারের কারণ নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, তেমনি মতভেদ আছে তাদের নৃতাত্ত্বিক বিভাজন নিয়ে। অর্থাৎ পন্ডিতগণ প্রায় একমত যে, বাংলায় ব্যাপক ধর্মান্তরের ফলেই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধর্মান্তর ব্যাপক হারে ঘটেছে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের থেকে। তবে অনেক পন্ডিত যেমন, ডঃ আব্দুর রহিম এই মত মানতে রাজি নন। তিনি একটি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ৭০ ভাগ ধর্মান্তরিত এবং বাকি ৩০ ভাগ বাইরের থেকে আগত। আর এই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক উচ্চ হিন্দুজাত। বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশ যে, ধর্মান্তরিত এ বিষয়ে এখন কারোই তেমন ভিন্ন মত নেই।

বাংলায় ইসলাম বিস্তার মূলত ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর রাজত্বকাল থেকেই শুরু হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বখতিয়ার খলজির বাংলা জয়ের পূর্বে বাংলায় মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠেছিল। ইসলাম বিস্তারের আদিকালে বাংলায় অনেক সুফির আগমন ঘটেছিল বলে যে জনশ্রুতি আছে তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সময়ে বাংলার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল বাণিজ্যিক কারণে। তাই পন্ডিতগণ একমত যে, বাংলায় ইসলাম বিস্তারের যাত্রা শুরু হয়েছিল সম্ভবত বখতিয়ার খলজীর আমল থেকেই। বখতিয়ার পরবর্তী সুলতানদের আমলে ইসলামে ধর্মান্তরের হার আরো বৃদ্ধি পায় এবং সুলতানি আমলের শেষের দিকে ইসলাম অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। বাংলায় সুফিদের আগমনের শতাব্দীওয়ারী হার থেকে বুঝা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে সর্বাধিক ৩৬% সুফি বাংলায় এসেছেন। তাই অনুমান করা যায় যে, এই সময়েই বাংলায় সর্বাধিক ধর্মান্তর ঘটে থাকতে পারে।

মুসলিম সমাজ গঠনে সুফি ও সুলতানদের ভূমিকা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতানি আমলের বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ইসলামের ব্যাপক বিস্তার। ইসলাম বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন অসংখ্য সুফি-সাধক এবং তাঁদের ইসলাম বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন মুসলমান সুলতানগণ।

যদিও অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলায় ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে সুলতানদের ভূমিকাই বেশি। কারণ তাঁরা অস্ত্রের মুখে মানুষকে ইসলামে ধর্মান্তরে বাধ্য করেন। তবে এই যুক্তি যথেষ্ট জোরালো নয়। কেননা অস্ত্রের মুখে ইসলাম প্রচার করলে ভারতে মুসলিম শাসনের প্রাণকেন্দ্র দিল্লিতে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বাংলায় সুলতানগণ জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার যেহেতু বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ইসলামের বিস্তার ঘটেনি, তাই ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সমাজ গঠনে সুলতানদের অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা আছে। সুলতানগণ জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত না করলেও একথা সত্য যে, সুলতানদের আনুকূল্য পাওয়ার আশায় অনেকে হয়তো ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

সুলতানগণ তাঁদের প্রেরিত অভিযান ও সেনাবাহিনীর দ্বারা পরোক্ষভাবে ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। আর সুফিগণ বিনা বাধায় ইসলাম প্রচার করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে সুলতানগণ মুসলিম সুফি দরবেশদের বিভিন্ন রকম সাহায্য-সহযোগিতা তথা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে ইসলাম বিস্তারকে উৎসাহিত করেছেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলায় ইসলাম বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালনকারীরা হচ্ছেন সুফি। তাঁদের উদার ও হৃদয়গ্রাহী প্রচারণায় সামাজিক প্রতিকূলতার মুখে হিন্দু-বৌদ্ধগণ ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুফিগণ সামাজিক স্তরবিন্যস্ত হিন্দু সমাজে ইসলামের বাণী প্রচার করে ধর্মান্তরের গতিকে বেগবান করেছেন।

হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা

বাংলায় মুসলমানদের শাসনামলে জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল হিন্দু, কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে বিরাজমান নানা প্রতিকূল অবস্থা এবং ইসলামের সাম্যের বাণীর প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং সুলতানি আমলের শেষের দিকে বাংলায় ইসলাম অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়।

হিন্দু সমাজ মূলত চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল যেমন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈশ্য এই তিন জাতির প্রাধান্য ছিল, শূদ্ররা ছিল একেবারে নিম্নস্তরে, অস্পৃশ্য এবং নিগৃহীত। ব্রাহ্মণেরা আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাদের ছিল অগাধ পান্ডিত্য। কায়স্থরা মোটামুটি লেখাপড়া জানতো। বৈশ্যরা ছিল কবিরাজ বা চিকিৎসক। ঝাড়ফুক, তন্ত্রমন্ত্রেও তাদের বুৎপত্তি ছিল। এছাড়া বণিক, স্বর্ণকার, কাঁসারি, শাঁখারি, গোয়ালা, নাপিত, মালাকার, কুমার, ধোপা, চাঁড়াল, ছুতার, কৈবর্ত, ডোম, মুচি, জেলে ইত্যাদি পেশার মানুষের নামও পাওয়া যায়। এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তবে মাঝেমধ্যে হতো। হিন্দু সমাজে আইন-কানুন বিধি নিষেধের কড়াকড়ি ছিল। এর ফল হয়েছিল অবশ্য উল্টো। মুসলমানদের সংস্পর্শে এলে হিন্দুদের জাত নষ্ট হতো। এছাড়া নানা ধরনের বর্ণ বৈষম্য ও শ্রেণীবিভাজন হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ঐতিহাসিকদের অনুমান, এই অংশটি ইসলামে ধর্মান্ড়রিত হয়।

হিন্দু সমাজের চালকের আসনে ছিল ব্রাহ্মণ। তবে বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সম্মুখীন হয়। মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজ অধঃপতিত ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সামাজিক জীবনকে কলুষিত করেছিল। মুসলিম শাসনে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব লোপ পায়। মুসলিম সংস্পর্শ ও সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্ট আলোড়ন ব্রাহ্মণদেরকে তাদের

আত্মপ্রসাদ ও ভোগ স্পৃহার জীবন থেকে কঠোরভাবে জাগিয়ে তোলে। এর ফলে তারা তাদের জীবন ও সমাজ সংস্কারের জরুরি প্রয়োজন উপলব্ধি করে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকটি সংস্কার আন্দোলনের আবির্ভাব হয়। সমাজ সংস্কারের এই উপলব্ধির প্রবাহে ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণব ধর্মের আকারে হিন্দু সমাজে একটি বড় ধর্মীয় বিপ্লবের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দু সমাজে একটি উন্নত ধরনের নৈতিক জীবনের আদর্শ তুলে ধরে। চৈতন্যদেব মানুষে মানুষে প্রেমের আহ্বান জানান, জাতিভেদ তুলে দেন, সমাজের রীতি-প্রথা অনেকটাই শিথীল করেন এবং এভাবে সম্ভাব্য সংকট থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন 'ভক্তি আন্দোলন' হিসেবেও পরিচিত। ষোল শতকের ইতিহাসে শ্রী চৈতন্য অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয়-সামাজিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের যাত্রা শুরু হয়। পুরো সুলতানি আমলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের রূপ-চিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু-বৌদ্ধ প্রধান বাংলায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে এবং মুসলিম সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলায় নবগঠিত মুসলিম সমাজ এবং তাদের পুরনো প্রতিবেশী হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন ছিল, তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।

বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করলেও তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও পন্ডিতগণ আলোচ্য সময়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্প্রীতি লক্ষ করেছেনঃ

মুসলমান শাসকগণ কোনোরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়াই অনেক হিন্দুকে রাজকার্যে সম্পৃক্ত করেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু সামন্ত, জমিদার, সেনাপতি ও সৈনিকদের সমর্থন ও সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁর একজন হিন্দু সেনাপতি ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী পরিচালনা করেন।

সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ বিখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত ও কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' উপাধিতে সম্মানিত করেন এবং সৈন্যদলে উচ্চপদও প্রদান করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালে দুজন ব্রাহ্মণ সহোদর রূপ ও সনাতন রাজদরবারে উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদমর্যাদা লাভ করেন। এভাবে সুলতানি আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমঝোতা ও সহযোগিতার পরিবেশ বিরাজ করছিল।

মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনে, শিক্ষায় ও ধর্ম প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হয়। মুসলমানরা হিন্দুদেরকে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, বিষ্ণু-উত্তর জমি দান করেন। মুসলমানরা অকুণ্ঠভাবে হিন্দুদের মধ্যে নিষ্কর জমি দান করেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন হিন্দু প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের আদর্শে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মতোই মুসলমান সমাজে শেখ ও সৈয়দরা কৌলিন্য দাবি করে শ্রেষ্ট আসন দখল করেন। তাছাড়া হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানরা তাদের সহজ-অনাড়ম্বর বিবাহ অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে। কুসংস্কার ও যাদুটোনার বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল প্রায় একই রকমের। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই উভয়ের সামাজিক বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করতো।

সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যে উদারপন্থী ধারা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সমন্বয় প্রচেষ্টার নিদর্শন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। এ আমলে মুসলমান লেখকেরা হিন্দু পুরাণ, গাঁথা এবং ঐতিহ্যকে

সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের মতোই অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে হিন্দু দেব-দেবীদের আখ্যান তারা রচনা করেছেন।

সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফল

হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে 'সত্যপীর' নামে হিন্দু ও মুসলমানের একজন এজমালী দেবতার উদ্ভব ঘটে। সত্যপীরের মহিমা ও বিভূতিকে বিষয়বস্তু করে বহু পাঁচালী ও পীর প্রশস্তি রচিত হয়। হিন্দুদের কাছে তিনি ছিলেন বিষ্ণুর অবতার সত্যনারায়ণ, আর মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন সত্যপীর। পীর, দরবেশ ছাড়াও বাংলার মুসলমানরা কিছু সংখ্যক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৌরাণিক নায়কের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন খাজা খিজির। হিন্দু সমুদ্রাধিপতি বরুণ দেবতার সাথে তার চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাঁচ পীরও হিন্দু ও মুসলমানদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সোনারগাঁয়ে পাঁচ পীরের দরগাহ তীর্থযাত্রীদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। আর এ কারণে সুলতানি আমলের সাহিত্যে সমাজের যে প্রতিফলন ঘটেছে তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

শাসনব্যবস্থা

সুলতানি আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থাকে দুটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করতে হবে। এর প্রথম পর্বে খলজী মালিকদের শাসন, আর দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীন সুলতানদের শাসন। আর এই দুই পর্বের শাসকদের শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে সুলতানি আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থার একটি সাধারণ রূপরেখা পাওয়া যাবে।

খলজী মালিকদের শাসন

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ ১২০৪ সালে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে। বখতিয়ার খলজী প্রথমে নদীয়া জয় করেন এবং পরবর্তীতে লখনৌতি অধিকার করেন। লখনৌতি অধিকারের ফলে বরেন্দ্রভূমির বিরাট এলাকা তাঁর হস্তগত হয় এবং এই বিস্তীর্ণ এলাকা শাসনের জন্য তাঁকে এক সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হয়।

নদীয়া জয়ের পূর্বে বখতিয়ার খলজী ভিউলী ও ভাগওয়াত নামক দুটি পরগণার শাসক ছিলেন। নদীয়া জয়ের পরেও তিনি নিজেকে কুতুবউদ্দিন আইবকের অমাত্যরূপে গণ্য করতেন। কারণ তিনি দিল্লিতে অনেক উপঢৌকন পাঠান। আবার সুলতান মুহাম্মদ বিন সামের নামে মুদ্রা জারি করেন এবং খোৎবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু দিল্লির কুতুবউদ্দিন আইবক মুহাম্মদ বিন সামের প্রতিনিধি ও সেনাপতি ছিলেন, সেহেতু বখতিয়ার খলজী কুতুবউদ্দিন আইবকের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তিনি লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন এবং তিব্বত অভিযানের পূর্বে নব বিজিত রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই অংশগুলোকে 'ইক্তা' এবং এর শাসনকর্তাকে 'মুক্তা' বলা হতো। আলী মর্দান খলজীকে বারসৌলের মুক্তা ও ইওয়াজ খলজীকে গঙ্গাতরীর মুক্তা নিযুক্ত করা হয়। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজীর অধীনে বাংলার মুসলিম রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে পড়ে।

ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে বাংলার স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি ঘটে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ১২৮৭ পর্যন্ত এটি দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশরূপেই ছিল। অবশ্য কিছুদিনের জন্য দিল্লি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা মুগিসউদ্দিন ইউজবেক ও মুগিসউদ্দিন তুঘ্রিল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বলবন বাংলা জয় করে তাঁর পুত্র বুঘরা খানকে এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য ইক্তায় মুক্তা নিয়োগ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর বুগ্‌রা খান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তী সুলতান রুকনউদ্দিন কায়কাউস

ও শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এবং এই সময়ে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

স্বাধীন সুলতানদের আমল

স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার মুসলমান রাজ্য 'বাংলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সময়ে বাংলায় মুসলমান শাসন বিস্তৃত হয়। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সারা বাংলা একীভূত এবং একক শাসনভুক্ত করেন। তাঁর সময় থেকে শেরশাহের সময়ের কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন ছিল। এই দীর্ঘ স্বাধীন সময়ে বাংলায় একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নিম্নে এই সময়ের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিকে তুলে ধরা হলো–

(ক) সুলতান

বাংলার সুলতানগণ বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করতেন এবং মুসলিম জাহানের অধিকর্তা খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। বাংলায় সুলতানরা যেমন 'সুলতান-উল-আজম' বা 'সুলতান-উল-আদিল' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন, তেমনিভাবে তাঁরা খলিফার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনসূচক 'নাসির-ই-আমীর-উল-মোমেনীন (বিশ্ববাসীদের নেতার সাহায্যকারী), 'ইয়ামীন-ই-খলিফত-উল্লাহ' (আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির ডান হাত) ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করতেন। খিলাফতের প্রতি আনুগত্য থাকলেও এই আনুগত্য ছিল সম্পূর্ণ মৌখিক এবং দলিলপত্রে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার সুলতানরা সকলেই সার্বভৌম ছিলেন এবং তাঁরা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁরা মুসলমানদের কাছে নিজেদের ইসলামের ধারক ও বাহক রূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন। ইসলামি আইন ও ইসলামি শাস্ত্রকে তাঁরা সম্মান করতেন।

সুলতানি আমলে বাংলার সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সুলতান। তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়োগ করতেন। তিনি আইন প্রণয়ন করতেন এবং শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিচার বিভাগেরও কর্তা ছিলেন। সুলতানরা সাধারণত ইসলামের বিধি বহির্ভুত কোন আইন প্রণয়ন করতেন না। তাছাড়া মুসলমান ও ইসলামের উন্নতি বিধান করাও সুলতানের দায়িত্ব ছিল বলে মনে হয়।

সুলতান যে প্রাসাদে অবস্থান করতেন সেখানে হাজিব, সিলাহদার, শরাবদার, জমাদার এবং দ্বারবাস প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত থাকতো। এসব পদস্থ কর্মচারীর বাইরে নিযুক্ত থাকতো অসংখ্য দাস-দাসী। দাস-দাসীদের মধ্যে হাবশীদের সংখ্যাই ছিল বেশি।

(খ) অমাত্যবর্গ

বাংলার সুলতানগণ সর্বদা 'আমীর' বা 'মালিক' প্রভৃতি উপাধিধারী অমাত্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। এই অমাত্যশ্রেণীর সকলেই বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পদে নিযুক্ত থাকতেন। এঁরা যুদ্ধ, শান্তি বা অন্যান্য কাজে সুলতানকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন এবং সক্রিয়ভাবে এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচন প্রশ্নে এই শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতির প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা দেখাতে বাধ্য ছিলেন।

(গ) উজির

সুলতানি আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থায় সুলতানের পরেই যার সর্বাধিক গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল, তিনি হলেন উজির। অনেক সময় সুলতান দুর্বল হলে বা রাজধানীর বাইরে গেলে উজিরই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অনেকে সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিংহাসনে আরোহণও করেন, যেমন, রাজা গণেশ ও হোসেন মক্কী প্রমুখ সিংহাসন অধিকারে সমর্থ হন। সাধারণত উজির সাধারণ শাসন ও রাজস্ব শাসনের

কর্ণধার ছিলেন। তবে বাংলার উজিরদের নানারকম কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল এবং একই ব্যক্তি এক সঙ্গে উজির, সর-ই-লস্কর ইত্যাদি কয়েকটি দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

(ঘ) রাজস্ব বিভাগ

সুলতানি আমলে বাংলায় একটি স্বতন্ত্র রাজস্ব বিভাগ ছিল। আর এই সময়ে রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল গণিমৎ, ভূমি, রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক এবং আবগারি প্রভৃতি। এই আমলে গণিমৎ থেকে রাজস্বের একটি অংশ এলেও এর প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। জমির উৎপাদিত ফসলের এক-পঞ্চমাংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে প্রদান করতে হতো।

সুলতানি আমলে বাংলার রাজস্ব বিভাগের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল বাণিজ্য শুল্ক। এ সময়ে বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক অগ্রসর ছিল। বিশেষ করে পর্তুগিজ নাবিকদের আগমনের ফলে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য কর ব্যতিত হাটকর, পথকর এবং ঘাটকরের উল্লেখও বিভিন্ন সাহিত্যিক সূত্রে পাওয়া যায়। তবে বাংলার সুলতান কর্তৃক জিজিয়া কর আদায়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(ঙ) সামরিক বিভাগ

সুলতানি আমলে বাংলার সুলতানদের শক্তির মূল ভিত্তি ছিল সামরিক বিভাগ। অমুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলে দক্ষ সামরিক বাহিনীর জোরেই সুলতানগণ তাঁদের শাসন ক্ষমতা সুচারুরূপে পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন। তাছাড়া দিল্লির সুলতানদের সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে বাংলার সুলতানদের সব সময় সতর্ক থাকতে হতো। প্রকৃতপক্ষে দিল্লির সুলতানগণ সুযোগ পেলেই বাংলা আক্রমণ করতেন। সর্বোপরি কামরূপ, ত্রিপুরা, আরাকান প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী শক্তির সাথে বাংলার সুলতানদের প্রায়ই বিরোধ লেগে থাকতো। তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেও সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্যই সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য।

সুলতানি আমলে অশ্বারোহী, পদাতিক ও হস্তিবাহিনীর সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হতো। সুলতান নিজেই এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তবে সুলতান ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতি নিয়োগ করতেন। যদিও অশ্বারোহী বাহিনীই সুলতানি বাহিনীর মূল শক্তি ছিল, তবে বর্ষাকালে এ বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তো। বর্ষাকাল ও নদীর কথা বিবেচনা করেই সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন। এবং এরপর থেকে মুসলিম শাসনের শেষ অবধি নৌবাহিনী ছিল সামরিক বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুলতানি আমলে যুদ্ধে তীর, ধনুক, নেজা (বর্শা), খঞ্জর এবং সামশীর (তরবারি) ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হতো। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সুলতানরা দুর্গ নির্মাণ করতেন।

(চ) বিচার বিভাগ

সুলতানি আমলে বাংলায় একটি স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ছিল। এই সময়ে বাংলায় শরীয়ত আইন বলবৎ ছিল। সুলতানের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানী ও ন্যায় বিচারক ছিলেন। তবে সুলতানের অধীনে দৈনন্দিন বিচারের ভার কাজির ওপর ন্যস্ত ছিল। শহরে ও গ্রামে কাজি নিযুক্ত হতেন। আলেম বা জ্ঞানীরা বিচার বিষয়ে কাজিদের সাহায্য করতেন। কোন কোন সুলতান নিজেদের বিরুদ্ধেও কাজির বিচার মেনে নিতেন। মুসলমান আমলে দেশরক্ষা ও রাজস্ব আদায় ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে গ্রামগুলো পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত ছিল। গ্রামের পঞ্চায়েতই গ্রামের শান্তি রক্ষার এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভার নিতো। এ সকল ব্যাপারে সামাজিক আইন চালু ছিল, বিশেষ করে হিন্দুদের সামাজিক ব্যাপারে হিন্দু আইন প্রচলিত ছিল।

(ছ) প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন

সুলতানি আমলে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হতো। গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশাসনিক ইউনিট ছিল ইকলিম এবং আরছা। ইকলিমকে বর্তমান সময়ের বিভাগ এবং আরছাকে বর্তমান সময়ের জেলার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইকলিম এবং আরছার ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের পদবি একই রকমের। বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, উজির, সর-ই-লস্কর, জামাদার-ই-গাহির মুহল্লী নামক পদবিধারীরাই ইকলিম ও আরছার শাসক ছিলেন। লিপি ও মুদ্রাসূত্রে শহর, কসবা, এবং খিত্তা নামের আরো কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটের নাম পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি নাম প্রায় সমার্থক। শহর শব্দের অর্থ শহর বা নগর; কসবা এমন এক নগর যার রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় নয় এবং খিত্তা যার রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়। তবে মনে হয় শহরের সাথে কসবা এবং খিত্তার পার্থক্য এই যে, শহর ব্যবসাকেন্দ্র, কসবা এবং খিত্তা সামরিক কারণে গঠিত নগর বিশেষ। এই হিসেবে কসবা এবং খিত্তাকে সামরিক ছাউনির সঙ্গে তুলনা করা যায়। খিত্তা হয়তো স্থায়ী সামরিক ছাউনিকে বলা হতো, এবং অস্থায়ী সামরিক ছাউনিকে কসবা বলা হতো। শহর, কসবা এবং খিত্তা উজির এবং সর-ই-লস্কর-এর অধীনে ছিল। এই আমলের আরেকটি প্রশাসনিক ইউনিট ছিল থানা, থানাও সর-ই-লস্করের অধীনে ছিল। আবার কয়েকটি মহালের সমন্বয়ে শিক গঠিত হতো। এই শিকের শাসনকর্তাকে বলা হতো শিকদার।

সুলতানি আমলের শিক্ষাব্যবস্থা

সুলতানি আমলে বাংলায় শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সুফি-দরবেশ এবং আলেম-উলামাগণ মুসলমানদের মধ্যে আর পন্ডিতগণ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। এই আমলে বাংলায় অসংখ্য মাদ্রাসা গড়ে ওঠে।

মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ছিল। তাদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রকে বলা হতো 'মকতব'। সাধারণত গ্রামের মসজিদে এসব মক্তব বসতো। কখনো কখনো কোন ব্যক্তির গৃহেও প্রাথমিক শিক্ষার কাজ চলতো। প্রতিটি মুসলমান বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতো। কারণ শিক্ষা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। সাধারণত গ্রামের কোন শিক্ষিত যুবক এসব পাঠশালা চালাতো।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে টোল ও মাদ্রাসা। সুলতানি বাংলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বা বেসরকারি উদ্যোগে অসংখ্য মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। এসব মাদ্রাসায় ইসলাম ও শরীয়া বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো। সাধারণত প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া সব কিছু বিনামূল্যে পরিচালিত হতো। অন্যদিকে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র টোলে সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানে বেদ, পুরাণ ইত্যাদি পড়ানো হতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি গুরুর গৃহে থেকে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতো। নবদ্বীপ ছিল হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র। এখানে বাংলা এমন কি বাংলার বাইরে থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তবে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য অবারিত ছিল না, অন্তত মুসলমানদের আসার আগ পর্যন্ত। তবে সুলতানি আমলে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে সবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন - এই বোধ অনেকের মধ্যে দেখা যায়।

কতিপয় মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্র

জ্ঞানার্জনে মুসলমানদের গভীর অনুরাগ, ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নে শেখ ও উলেমাদের উদ্যম, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শাসনকর্তাদের পন্ডিত, কবি, বিদ্বান ব্যক্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির ফলে বাংলায় উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ আসে। শহরের প্রধান প্রধান অঞ্চলসমূহে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। সুলতান ও আমির-ওমরাহরা মাদ্রাসা স্থাপন ও এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং প্রচুর দানের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতায় গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে লক্ষণাবতী বা গৌড়ে

প্রতিষ্ঠিত দরাসবাড়ি মাদ্রাসা বিখ্যাত। কাজি রুকনউদ্দিন সমরকন্দীসহ আরো বহু পন্ডিত গৌড়ে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিবৃত্ত ছিলেন। এরপর মহিসুল যা বর্তমান রাজশাহী জেলার মহিসন্তোষ নামে খ্যাত - এখানে মুসলিম শিক্ষার উচ্চ কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত সুফি পন্ডিত এহিয়া মানেরী, মাওলানা তকিউদ্দিন আরাবী, মহিসুল শিক্ষাকেন্দ্র থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। সুলতানি আমলে সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সোনারগাঁও-এর শিক্ষাকেন্দ্র অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী মাওলানা শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামার অধীনে পরিচালিত হতো। বাংলার বাইরে থেকে এসেও অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করতো। তাছাড়া পান্ডুয়া এবং রাজশাহীর বাঘা প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

সুলতানি আমলে বাংলার অর্থনীতি

কৃষি

সুলতানি আমলে বাংলা অর্থনৈতিক জীবনে নিশ্চিতরূপে যথার্থ অগ্রগতি লাভ করে। পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাংলার স্বর্ণমুদ্রা, এমনকি রৌপ্যমুদ্রাও অনুপস্থিত ছিল। মুসলমান শাসনের শুরু থেকে এদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। এটা মুসলমান আমলে বাংলায় অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। এ আমলে বাংলায় উন্নত কৃষি, শিল্প এবং ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল।

বাংলা একটি নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদ-নদী এবং ঋতুমাফিক বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থার ফলে বহু শতাব্দীব্যাপী বাংলার সমতলভূমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল ছিল। ভ্রমণকারীগণ বাংলার মাটির অসাধারণ উর্বরতা লক্ষ করেছেন। এই উর্বরতা প্রচুর শস্য, শাক-সব্জি এবং ফলমূল উৎপাদনে সহায়তা করে। ধান ছিল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। বাংলায় নানা রকমের ধান উৎপন্ন হতো। দেশের প্রয়োজন মেটানোর পর প্রচুর ধান বা চাল বিদেশে রপ্তানি করা হতো। রপ্তানিযোগ্য আরেকটি শস্য ছিল ইক্ষু। এটিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। অন্যান্য ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লাক্ষা, তুলা, মরিচ, সরিষা ইত্যাদি।

বাংলায় উৎপন্ন অন্যান্য ফসলের মধ্যে পাট ও গুটি পোকার চাষ তথা রেশম ছিল অন্যতম। মুসলিম আমলের প্রথম দিকে খুবসম্ভবত চীন থেকে গুটি পোকা আনা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলায় এর উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে হতো এবং রেশমি বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হতো।

শিল্প

সুলতানি আমলে বাংলায় শিল্প-কারখানার প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। বাংলার শিল্পের মধ্যে বয়ন শিল্প ছিল অন্যতম। সূক্ষ সুতিবস্ত্রের সুনাম ও চাহিদা ছিল জগৎজোড়া। সবচেয়ে সূক্ষ ও উন্নতমানের সুতিবস্ত্রের নাম ছিল 'মসলিন'। এটি ছাড়াও নানা নামের এবং মানের সুতি ও রেশমিবস্ত্র বাংলায় উৎপন্ন হতো। মসলিন ও রেশম শিল্প মুসলিম শাসক, অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। বাংলায় ইক্ষুর উৎপাদন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এই ইক্ষু হতে চিনি উৎপাদিত হতো। মুসলমান আমলে চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। চিনির মতো লবণ ছিল আরেকটি প্রধান শিল্প। সমুদ্রের পানি এবং লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদিত হতো। এছাড়া জাহাজ নির্মাণ শিল্পেও বাংলার গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল।

বাণিজ্য

সুলতানি আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুল সম্প্রসারণ ঘটে। কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্বৃত্ত ব্যাপক বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। মুসলিম শাসনের শুরুতে চট্টগ্রাম, সাতগাঁও প্রভৃতি সমুদ্রবন্দর দিয়ে বাংলায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হতো। আর রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল সুতিবস্ত্র, চাউল, চিনি, রেশম, আদা, মরিচ, লাক্ষা, হরিতকী ইত্যাদি। বিপুল পরিমাণ রপ্তানির জন্য বাংলায় বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই অনুকূল ছিল। সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাংলায়ই উৎপাদিত হতো বাংলায়ই সমগ্র সুলতানি আমলে বাংলায় এই ব্যাপক অনুকূল বাণিজ্য বজায় ছিল।

স্থাপত্য শিল্প

সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্য শিল্প এই এলাকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এর ফলে বাংলার স্থাপত্য শিল্পে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এই প্রদেশের স্থাপত্য শিল্প এর মাটির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কযুক্ত ও স্থানীয় রীতিনীতির সাথে মুসলিম চিন্তাধারার সমঝোতারই ফল। ভারতীয় উপমহাদেশ জয় করার পূর্ব থেকেই মুসলমানদের নিজস্ব উন্নত স্থাপত্যশিল্প ছিল। এটা ছিল পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্যশিল্পের ঐতিহ্য। কিন্তু মুসলিম নির্মাতাগণকে উপমহাদেশে স্থাপত্য নির্মাণ করতে স্থানীয় ও সহজলভ্য মাল-মসলা ও রাজমিস্ত্রির ওপর নির্ভর করতে এবং পরিবেশের ওপর নজর রাখতে হয়েছে।

বাংলার স্থাপত্যশিল্প ভূমির প্রকৃতি, আবহাওয়া ও সহজলভ্য উপাদানের দ্বারা নির্মিত হয়। কাদামাটির সহজলভ্যতার কারণে এখানকার স্থাপত্য নির্মিত হতো ইট দ্বারা। ইটের সাথে অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হতো টেরা-কোটা। টেরা-কোটাকে অলঙ্কৃত পোড়ামাটির ফলক বলা যায়। এটি বাংলার নিজস্ব শিল্প এবং এগুলো তৈরিতে শিল্পীরা পারিপার্শ্বিকতা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতো।

বাংলা অঞ্চলের ঘর-বাড়িগুলো দুই ধরনের উপাদানে নির্মিত হতো। একটির নির্মাণ উপকরণে ব্যবহৃত হতো বাঁশ ও ছন এবং অন্যটিতে ব্যবহৃত হতো ইট। বাঁশের তৈরি ঘরের ছাদ ছিল বক্রাকার। পরবর্তীতে মুসলমানরা তাদের ইট নির্মিত ভবনেও বক্রাকার ছাদ সংযোজন করে।

সুলতানি আমলে নির্মিত বাংলার স্থাপত্যসমূহের মধ্যে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, মালদহের গুণমন্ত মসজিদ ও জামে-ই-মসজিদ, পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ত্রিবেণী, সাতগাঁও এবং হুগলী জেলার ছোট পান্ডুয়ায় নির্মিত অট্টালিকাগুলো ছিল সুলতানি স্থাপত্যের গঠন পর্ব। সমাধি সৌধের মধ্যে এক লাখী সমাধি প্রধান। গৌড়ে অবস্থিত দাখিল দরওয়াজা ও তাঁতীপাড়া মসজিদও সুলতানি স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

সারসংক্ষেপ

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর নানাবিধ প্রভাব বিস্তার করেছে। সুলতানি আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক অবস্থার ওপরও এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অনুভূত হয়। বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ এবং এরপর এ অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। অত:পর ইসলাম বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়। অত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনাচারের অনেক উপাদান নিয়েই এখানে বাঙালি মুসলমানদের উত্থান ঘটে। শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি বন্ধের উদ্যোগ নেন এবং সমূহ ধ্বস থেকে বাংলার হিন্দুদের রক্ষা করেন। প্রশাসনিক দিক থেকে বাংলায় মুসলমানদের হাতে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রাদেশিক এবং স্থানীয়ভাবে সুবিন্যস্ত শাসন কাঠামো গড়ে ওঠে। মুসলমানদের অধীনে বেশ কিছু শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। অবশ্য এসব স্থানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। সুলতানি আমলে বাংলার আর্থ-বাণিজ্যিক জীবন যথার্থ অর্থেই অগ্রগতি লাভ করে। ঐতিহাসিকদের মতে, এ আমলে বাণিজ্য ছিল বাংলার অনুকূলে। স্থাপত্য শিল্প এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পকলার ক্ষেত্রেও স্থানীয়ভাবে 'বঙ্গীয় মুসলিম রীতি' বিকশিত হয়। এক্ষেত্রে মুসলমান শাসকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রথম আদমশুমারীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়–

(ক) ১৮৮১ সালে (খ) ১৮৯১ সালে

(গ) ১৮৭২ সালে (ঘ) ১৮৮২ সালে।

২। কোন শতাব্দীতে সবচাইতে বেশি সুফি বাংলায় আসেন?

(ক) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (খ) চতুর্দশ শতাব্দীতে

(গ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে (ঘ) দ্বাদশ শতাব্দীতে।

৩। পাঁচপীরের দরগাহ কোথায় অবস্থিত?

(ক) সোনারগাঁ (খ) চট্টগ্রাম

(গ) সিলেট (ঘ) ঢাকা।

৪। শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা কোন শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়োজিত ছিলেন?

(ক) সোনারগাঁ (খ) সাতগাঁও

(গ) দরাসবাড়ি (ঘ) পান্ডুয়া।

৫। 'শিক' গঠিত হতো–

(ক) থানার সমন্বয়ে (খ) মহালের সমন্বয়ে

(গ) কসবার সমন্বয়ে (ঘ) আরছার সমন্বয়ে।

৬। ইক্তার শাসনকর্তাকে বলা হতো–

(ক) ইক্তাদার (খ) সর-ই-লস্কর

(গ) শিকদার (ঘ) মুক্তা।

৭। 'দাখিল দরওয়াজা' কোথায় অবস্থিত?

(ক) গৌড় (খ) পান্ডুয়া

(গ) সোনারগাঁ (ঘ) সাতগাঁও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সুলতানি আমলের বাংলায় হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা বিবৃত করুন।

২। সুলতানি আমলের শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় ইসলাম বিস্তার এবং মুসলমান সমাজ গঠনে সুফি ও সুলতানদের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

২। সুলতানি বাংলার শাসন ব্যবস্থার চিত্র অংকন করুন।

৩। মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক জীবন ও শিল্পকলা সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস।*

২। আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস।*

৩। M.R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal.*

৪। মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।*

৫। Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal*. Vol-II.

৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ১। (ক) ; ২। (গ) ; ৩। (খ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ক) ; ৬। (গ)।

পাঠ : ২ ১। (খ) ; ২। (গ) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (খ)।

পাঠ : ৩ ১। (খ) ; ২। (খ) ; ৩। (খ) ; ৪। (ক)।

পাঠ : ৪ ১। (গ) ; ২। (খ) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (ক) ; ৫। (খ) ; ৬। (খ)।

পাঠ : ৫ ১। (ঘ) ; ২। (গ) ; ৩। (খ) ; ৪। (ক) ; ৫। (গ) ; ৬। (ঘ) ; ৭। (ক)।

পাঠ : ৬ ১। (গ) ; ২। (গ) ; ৩। (খ) ; ৪। (ক)।

পাঠ : ৭ ১। (গ) ; ২। (খ) ; ৩। (ক) ; ৪। (ক) ; ৫। (খ) ; ৬। (ঘ) ; ৭। (ক)।